www.banglainternet.com
represents

Jana Ajanar Deshe

By

Abdulla Al-Muti

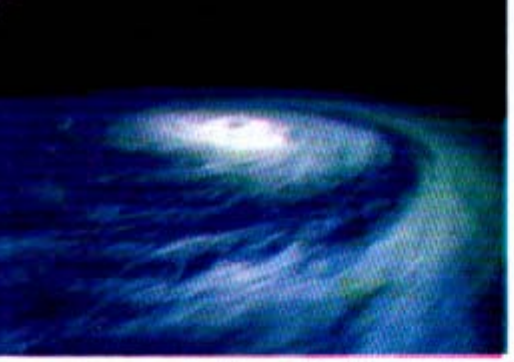

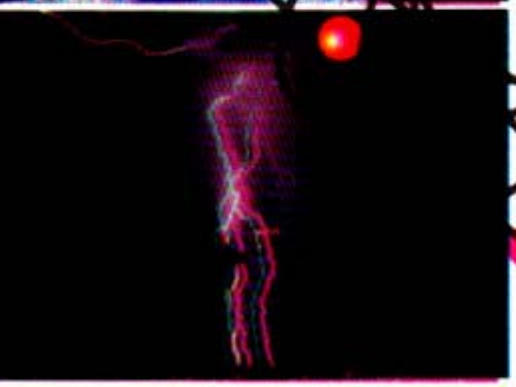

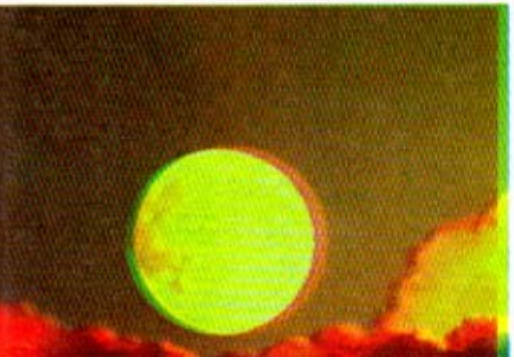

জানা অজানার দেশে

ড. আব্দুল্লাহ্ আল মুতী শরফুদ্দীন

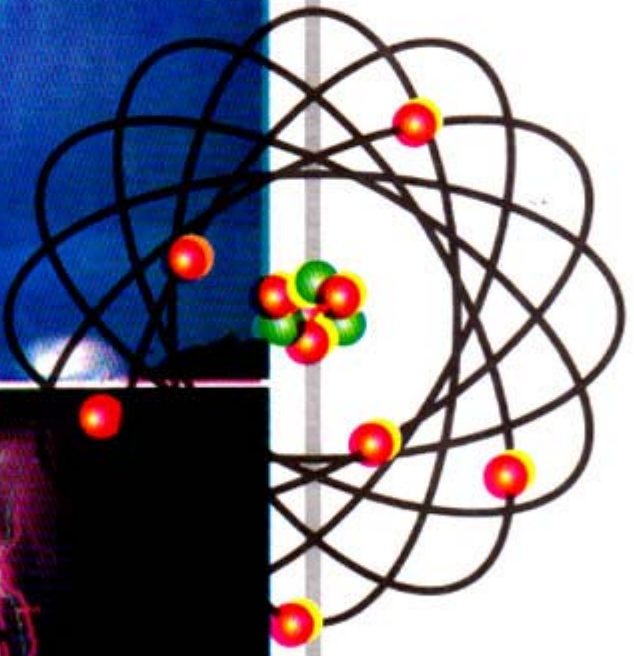

জানা-অজানার দেশে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

সূচী পত্র

পদার্থ-অপদার্থের কথা	৯
পাতায় পাতায় নিশির শিশির	১৩
পানির অপর নাম জীবন	১৬
হাওয়ায় হাওয়ায়	২১
রঙধনু কেন ওঠে?	২৬
মেঘেরা কি করে আকাশে ভেসে থাকে	২৯
মেঘের পাড় রুপোলি কেন ?	৩৪
বজ্র হাসে মেঘের কোলে	৩৭
বিজলি থেকে সাবধান	৪২
বেড়িয়ে আসি চাঁদের দেশে	৪৬
হে সূর্য, তুমি আমাদের	৪৯
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা	৫৫
আর এক পৃথিবীর জন্যে	৬১
ছোট আর বড়	৬৩

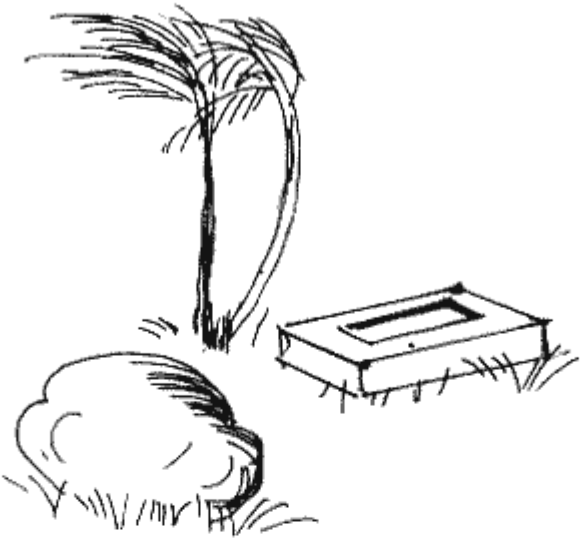

পদার্থ-অপদার্থের কথা

যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বলো দেখি এ যুগের সবচেয়ে বড় দার্শনিক কে, তাহলে জানি সবাই ঘাড় চুলকাতে শুরু করবে।

দার্শনিক! দার্শনিক! লম্বা লম্বা চুল। উদাস দৃষ্টি। নাঃ! একটা নামও যদি মনে পড়ে!

থাক, আর কষ্ট করতে হবে না। উত্তরটা আমিই বলে দিচ্ছি। সেই সবসেরা দার্শনিকের নাম হল 'টুনটুন'। কি, অবাক হলে? ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে মিলে যদি একথা সাব্যস্ত করে থাকে তাহলে আমি আর কি করতে পারি বল? টুনটুনকে দেখলে যে-কেউ বুঝবে তার মাথায় নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা কিলবিল করছে। এমন সব কথা যা হয়তো আর কারো মাথায় কস্মিনকালেও আসবে না। যেমন ধর, আজকাল সে মাথা ঘামাচ্ছে ভূত-পেত্নীরা যদি চোখের পলকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে পারে, তাহলে কি দিয়ে তৈরি তারা।

বাংলাইন্টারনেট.কম

সেতু আপা ক্লাসে অঙ্ক কষতে কষতে মাঝে মাঝে বেজায় রেগে যান। সেদিন তিনি রেগে-মেগে রিটাকে বলেছিলেন, তুমি একটা অপদার্থ, মাথায় কিচ্ছু নেই, শুধু গোবর পোরা। ক্লাসের পর টুনটুন মেয়েদের বলল, আপা কিন্তু কথাটা ঠিক বলেন নি। প্রথম কথা হল বুদ্ধি কম হোক বেশি হোক সব মানুষের মাথাতেই ঘিলু থাকে, গোবর থাকে না। তাছাড়া মানুষ কখনো অপদার্থ হতে পারে না। মেয়ে হোক ছেলে হোক মানুষমাত্রেই পদার্থ।

বরাবরের মতোই মেয়েরা দার্শনিক টুনটুনের কথায় রীতিমতো মজা পেল। স্বপ্না জিজ্ঞেস করল, তাহলে অপদার্থ কি তাই বল না?

টুনটুন বলল, যা কিছু ধরাছোঁয়া যায়, জায়গা দখল করে থাকে তাই হল পদার্থ। আর যা এর ঠিক উলটো, অর্থাৎ জায়গা দখল করে থাকে না, ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে বলতে পারিস অপদার্থ। যেমন — ধর ভূত-প্রেত্ব পরীরা হল সব অপদার্থ।

মাগো! ভূত-পেত্নীর কথা শুনলে গা কেমন ছম ছম করে! কথাটা তাই আর বেশি এগুলো না।

কিন্তু তোমরাই এবার বল, পদার্থ-অপদার্থের ব্যাপারটা কি এতে পরিষ্কার হয়ে গেল? 'পদার্থ' অর্থাৎ আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস রয়েছে তা যে আসলে কী সে কথা মানুষ ভাবছে সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকে। পদার্থের আসল রূপ যে কতভাবে মানুষ বোঝাতে চেয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীস দেশে এক মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল থেলিস।

থেলিস বলেছিলেন, আমাদের চারপাশে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম জিনিস আছে তার সব কিছুর গোড়ায় রয়েছে পানি। পানি থেকেই আসে নানান জিনিসের নানা রূপ, কখনো তরল, কখনো কঠিন, কখনো বায়বীয়। কাজেই এই পানি ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

এরপর আরেক মস্ত বড় গ্রীক পণ্ডিত বললেন, না পানি নয়, দুনিয়ার সব পদার্থের গোড়ার জিনিস হলো হাওয়া। হাওয়া থেকেই সৃষ্টি আর সব কিছুর।

আরেকজন বললেন, পানি বা হাওয়া নয়, আসল জিনিস হল আগুন, আগুনই দুনিয়ার পরম সত্য।

এলেন আরেক পণ্ডিত। তিনি বললেন, এসব কোনটাই নয়, এদের সাথে যোগ করতে হবে মাটি। কেননা মাটি থেকেই জন্মায় দুনিয়ার আর সব কিছু। পানি, হাওয়া, আগুন আর মাটি মিলিয়েই তৈরি দুনিয়ার বাকি সব পদার্থ।

এলেন আরেক দার্শনিক। বললেন, পানি, হাওয়া, আগুন আর মাটি যাই বল না কেন, সব বস্তুর গোড়ার কথা হল কণা। এত ছোট কণা যাকে আর ভাগ করা যায় না। অতি ছোট অণু, অর্থাৎ পরমাণু—এই পরামাণু থেকেই সৃষ্টি হয় দুনিয়ার সব জিনিস।

একথা বলেছিলেন লিউসিপাস আর তাঁর শিষ্য ডেমোক্রিটাস।

কিন্তু তাঁদের কথা কেউ মানলো না। মাটি, পানি এমনি সব সাধারণ জিনিস থেকে দামী দামী জিনিস তৈরির চেষ্টায় মেতে উঠলেন পণ্ডিতেরা। সৃষ্টি হল আলকিমীয়া শাস্ত্রের। পণ্ডিতরা বললেন, এক জিনিস থেকে আরেক জিনিস তৈরির কৌশল রয়েছে এক আশ্চর্য পাথরে—তার নাম 'পরশ-পাথর'।

এই পরশ-পাথরের ছোঁয়া পেলেই মাটি, পাথর, লোহা সব কিছু হয়ে যায় চকচকে সোনা। তাঁরা বললেন, ঠিক তেমনি জীবনের আশ্চর্য রহস্য লুকানো আছে এক জিনিসে, তার নাম 'অমৃত'। এই অমৃত খেলে জরা-বার্ধক্য-মৃত্যুকে ঠেকিয়ে চিরযৌবন লাভ করা যায়। সেই হাজার দুই বছর আগে থেকে শুরু করে মাত্র শ'দুই বছর আগ পর্যন্ত ও কিমিয়ার সাধকরা স্পর্শমণি আর অমৃতের সাধনায় দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। আর এই সাধনা থেকে সোনা তৈরির তেলেস্‌মাতী না পেলেও তাঁরা পদার্থের কথা জেনেছেন অনেক কিছুই।

আজ আমরা জানি পদার্থ মাত্রই একে অন্যকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বা টানকে আমরা বলি মহাকর্ষ। যেহেতু তুমিও পদার্থ আবার পৃথিবীটাও পদার্থ সেই জন্যে পৃথিবী টানছে তোমাকে, সেটাকেই আমরা বলি তোমার ওজন। তুমিও কিন্তু টানছ পৃথিবীকে, কিন্তু সে টান এত কম যে, তাতে পৃথিবী নড়ছে না এক চুলও। পৃথিবী আমাদের হরদম টানছে বলেই রাস্তায় চলবার সময় আমাদের এই টান বাঁচিয়ে ব্যালান্স রেখে সাবধানে পা ফেলতে হয়। আর তাই পিছল জায়গায় একটু অসাবধান হয়েছ কি অমনি 'পা পিছলে আলুর দম'!

বাংলাইটারনেট.কম

বিজ্ঞানীরা এই আকর্ষণ সম্বন্ধে নানা নিয়ম-কানুন জেনেছেন। যেমন ধর, যে জিনিসে পদার্থ বেশি থাকবে তার ওপর টান বেশি পড়বে। অর্থাৎ তোমার ওপর পৃথিবীর টান যতটা, তোমার আব্বার ওপর টান তার চেয়ে বেশি। পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে গেলে সাথে সাথে টানটাও কমতে থাকে।

একটা জিনিসের মধ্যে পদার্থের পরিমাণ স্থির থাকলেও তার ওজন যে সব সময় একই থাকবে তার কোন কথা নেই। তোমার ওজন হয়তো ত্রিশ কিলোগ্রাম। কিন্তু যদি হাজির হও গিয়ে চাঁদে তাহলে দেখবে চাঁদের হালকা টানে তোমার ওজন হয়ে গিয়েছে মোটে পাঁচ কিলোগ্রাম। সেই হালকা শরীর নিয়ে উঁচু উঁচু লাফ দিতে কি মজাটাই যে হবে! আবার যদি রওনা দাও মহাকাশে দূরের কোন গ্রহের দিকে তাহলে এত দূরে নভোযানের ভেতর পৃথিবীর আকর্ষণ হয়ে পড়বে অতি সামান্য—অর্থাৎ তোমার কোন ওজনই থাকবে না।

তাহলে দেখলে তো, কোন জিনিসের স্থির নির্দিষ্ট ওজন কিছু আছে কিনা বলা মুশকিল। এমনকি পৃথিবীর আকারটা পুরোপুরি গোল নয় বলে তার ওপরেও একেক জায়গায় টানের কিছুটা হেরফের হয়। ঠিক বিষুব রেখার ওপর দাঁড়ালে তোমার যা ওজন হবে, সুমেরু বা কুমেরুর ওপর দাঁড়ালে হবে তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি।

তোমরা হয়তো ভাবছো, আচ্ছা, দুনিয়ার সব কিছুই কি তাহলে পদার্থ? পদার্থ ছাড়া কি আর কিছুই নেই? যেমন শব্দ, আলো এগুলোও কি পদার্থ? জ্বী না, এগুলো পদার্থ নয়, শক্তি। অর্থাৎ এগুলোকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, ওজন করা যায় না—শুধু এদের কাজ দিয়ে অনুভব করা যায়।

আজকালকার বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলছেন পদার্থ আর অপদার্থের মধ্যে তফাতটা খুব আঁটসাঁট নয়! কেননা পদার্থকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে বদলে ফেলা যায়; যেমন আণবিক বোমায় পদার্থ ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড শক্তি।

ভাগ্যিস,,টুনটুন একথা এখনও শোনে নি। শুনলে না জানি আর কোন্ দার্শনিক তত্ত্ব বের করবে। হয়তো বলবে ঃ রিটার কিচ্ছু ভাবনা নেই। শক্তি যদি অপদার্থ হয় তাহলে অপদার্থ হওয়া এমন আর খারাপ কথা কি!

বাংলাইন্টারনেট.কম

পাতায় পাতায় নিশির শিশির

বোধ করি কোনকালে কোথাও নন্দ ঘোষ নামে একটা লোক ছিল। আর কি জানি, নন্দ ঘোষ লোকটা হয়তো ছিল খুব খারাপ, আর নইলে ছিল নেহাত বোকা। তাই লোকে বলত, "যত দোষ নন্দ ঘোষ।"

আমাদের বাসায় বাচ্চু এমনি এক ছেলে বারে—যাকে বিনু-মিনু-ঝিনু সবাই বলে, "একেবারে বোকার একশেষ।" মাঝে মাঝে বাচ্চু এমন সব কথা বলে যা শুনে সবাই হেসে লুটোপুটি হয়।

একদিন বিনু এসে বলল, "মামা, শুনেছ, বাচ্চু বলে কিনা কলসী নাকি ঘামে। কলসী কি মানুষ নাকি যে ঘামবে?"

আমি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কথাটার দিকে তেমন আর মন দিই নি।

বাংলাইন্টারনেট.কম

কিন্তু দুপুরে খেতে বসে বুঝলাম, কথাটা বাচ্চুর কানে গিয়েছিল ঠিকই।

টেবিলে একটা পেতলের জগে ঠাণ্ডা পানি রাখা ছিল। বাচ্চু হঠাৎ সেখানে এসে বলল, "আপামণি, আপনে তো আমার কথা বিশ্বাস করেন না। দেখেন জগটা ঘামতেছে।" জগের গা থেকে সত্যি টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছিল।

এতক্ষণে রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। মিনু জিজ্ঞেস করল, "সত্যি কি জগ মানুষের মতো ঘামে নাকি মামা?"

দেখলাম, এবার কিছু একটা জবাব না দিলে মিনুর মান রাখা দায়। তাই বললাম, "মানুষ যখন ঘামে, তখন পানিটা আসে আমাদের শরীরের ভেতর থেকে। কিন্তু এখানে পানি তো জগের ভেতর থেকে আসছে না, আসছে বাইরের হাওয়া থেকে।"

কিন্তু এইটুকু বলে আমি পড়ে গেলাম বিপদে। আমাকে বলতে হল আরো নানা কথা। হাওয়ার ভেতর আবার পানি এলো কোথা থেকে? জগের ওপর পানি জমে তো আর সব কিছুর ওপর জমে না কেন? শীতের দিনে ঘাসের ডগায় ডগায় যে শিশির জমে, তাও কি তাহলে হাওয়া থেকেই আসে? এমনি আরো কত প্রশ্ন।

আমাদের চারপাশে হাওয়ার বুকে যে পানি ভেসে বেড়ায়, তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় বর্ষার দিনে। সব কিছু কেমন ভেজা সপসপে হয়ে থাকে। নুন খোলা পাত্রে রাখলে হাওয়ার পানি নুনের সাথে মিশে নুনগুলোকে কেমন গলিয়ে পানির মতো করে ফেলে।

আসলে কিন্তু খালি বর্ষার দিনে নয়, সব সময়েই হাওয়ায় কিছু না কিছু পানি থাকেই। গরম হাওয়ায় পানি ভেসে থাকতে পারে বেশি পরিমাণে; ঠাণ্ডা হাওয়ায় কম। শীতের দিনে তাই হাওয়া কিছুটা শুকনো থাকে। এজন্যে ভেজা কাপড়-চোপড় ছায়ায় মেলে দিলেও বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। বর্ষাকালে হাওয়ায় পানি থাকে খুব বেশি, ভেজা কাপড় আর কিছুতেই শুকোতে চায় না।

শীতকালে হাওয়ায় পানি কম থাকলে কি হবে, কোন ঠাণ্ডার ছোঁয়া পেয়ে হাওয়া যদি খুব ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, তাহলে হাওয়ার ভেতরকার বাষ্প জমতে শুরু করে দেয়। তাই গ্লাসে বা জগে ঠাণ্ডা পানি রাখলে তার ছোঁয়ায় আশেপাশের

হাওয়া খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর সেই ঠান্ডা হাওয়ায় ভেসে থাকা পানির বাষ্প জগ বা গ্লাসের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে জমতে থাকে।

শীতের রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে পৃথিবীর গা থেকে খানিক তাপ ছিটিয়ে যায় মহাশূন্যে। আর মাটি, ঘাস, গাছপালা, বাড়ির টিনের চাল হয়ে পড়ে খুব ঠাণ্ডা। তখন এসবের ছোঁয়ায় হাওয়ার পানিও ঠাণ্ডা হয়ে জমতে থাকে ফোঁটায় ফোঁটায়। সকালবেলা ঘাসের শিষে শিষে, মাকড়সার জালে, কচুপাতার ওপর মুক্তোর দানার মতো টলটলে পানির ফোঁটা ঝিকমিক করতে থাকে। শেষরাতে টিনের ঘরের চাল থেকে টপটপ করে ঝরতে থাকে শিশির।

আকাশে যদি মেঘ করে থাকে, তাহলে পৃথিবীর বুকে দিনের বেলা যে তাপ জমে, তা রাতারাতি মহাশূন্যে পালিয়ে যেতে পারে না। তাই তখন হাওয়া তত ঠাণ্ডা হয় না। আর তেমন শিশিরও জমতে পারে না। আবার যদি জোরে এলোমেলো হাওয়া বয়, তাহলেও হাওয়ার বাষ্প পানির ফোঁটা হয়ে জমে না।

কিন্তু সকালবেলা শিশিরবিন্দুগুলো যায় কোথায়? শীতের সকালে মিষ্টি রোদ ওঠে; আর তখন সেই সোনালী আলো পড়ে শিশিরের কণাগুলো মুক্তোর মতো ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই রোদের তাপে ঘরের চাল, ঘাস, পাতা, হাওয়া সব কিছু গরম হয়ে ওঠে। গরম হাওয়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে বেশি বাষ্প ভেসে থাকতে পারে। কাজেই পানির বিন্দুগুলো সব বাষ্প হয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ঘাসের ডগা থেকে, মাকড়সার জাল থেকে, কচুপাতার বুক থেকে মুক্তোর দানার মতো পানির কণাগুলো হারিয়ে যায় ক্রমে ক্রমে।

বাচ্চুটা কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাগুলো। শেষটায় সে বলল ঃ "অ! জগ, গেলাস, কলসী এগুলো আসলে ঘামে না তইলে। আমি ভাবছিলাম বুঝি—"

বিনু এমন একটা ভাব করল, যেন এসব কথা আগে থেকেই জানত সে। বাচ্চুকে বলল ঃ "তুই তো আস্ত বোকা কোথাকার! তোকে আমি বলেছিলাম না আগেই—"

বাংলাইন্টারনেট.কম

পানির অপর নাম জীবন

তর্কটা শুরু হয়েছিল নাবীল আর মিনুর মধ্যে।

নাবীল বলছিল, "রোজ আমাদের অন্তত দশ গ্লাস করে পানি খাওয়া দরকার।"

মিনু উড়িয়েই দিল ওর কথা ঃ "আরে দূর দূর! আমি তো সারা দিনে এক গ্লাসের বেশি খাই না।"

তখন নাবীল বলল ঃ "আচ্ছা এসো বাজি রাখি, ক'দিন তুমি থাকতে পারবে একদম পানি না খেয়ে।"

এবার মিনু পড়ল ফাঁপরে। আর এ থেকেই কথা উঠল পানি আমাদের জীবনের জন্যে কত দরকারী তা নিয়ে।

পৃথিবীতে যদি পানি না থাকত, তাহলে আদৌ সম্ভব হত না এখানে মানুষের বেঁচে থাকা। এমন কি কোন ধরনের উদ্ভিদ বা জীবজন্তুই টিকতে

বাংলাইন্টারনেট.কম

পারত না পৃথিবীর বুকে। সৌরজগতের আর কোন গ্রহে পৃথিবীর মতো এমন প্রচুর পানি নেই; তাই সৌরজগতের কোথাও পৃথিবীর মতো এমন প্রাণেরও হদিস পাওয়া যায় নি।

এটা আমাদের এক মস্ত বড় সৌভাগ্য যে, পৃথিবীর ওপরকার বিশাল এলাকা ঢাকা আছে পানিতে। আদতে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে ডাঙ্গার চেয়ে পানিই চোখে পড়বে বেশি। পৃথিবীর ওপরকার এলাকার দশ ভাগের সাত ভাগ হল পানি আর মাত্র তিন ভাগ ডাঙ্গা। আবার মানুষের শরীরেও প্রতি দশ ভাগে পানি রয়েছে সাত ভাগ। হাড়, মাংস, চর্বি সব কিছু মিলে হল বাকি আর তিন ভাগ।

পানি যে শুধু সব রকম প্রাণী আর উদ্ভিদের দেহকে চালু রাখতে সাহায্য করে তাই নয়। পানির সরবরাহ সম্ভব করে সব রকমের চাষবাস আর খাবার-দাবার তৈরি। নদীতে, সমুদ্রে পানি দেয় যাতায়াতের ব্যবস্থা। প্রায় সব রকম কলকারখানায় দরকার প্রচুর পরিমাণ পানি। নদী–খাল-বিল-সমুদ্র জন্মায় মাছ প্রভৃতি নানা ধরনের খাদ্য। হাওয়ায় পানি আছে বলেই সম্ভব হয় বৃষ্টি-বাদল, মেঘ, আবহাওয়ার বৈচিত্র্য। উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়া পানির ধারা থেকে জন্মানো হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি।

অসংখ্য নদীনালা, খাল-বিল মিলিয়ে বাংলাদেশ হল পানির দেশ। বিশাল বিপুল নদী গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা বয়ে চলেছে এদেশের ওপর দিয়ে। আদতে এসব নদীর প্রবাহ থেকেই জেগে উঠেছে এদেশের বেশিরভাগ জমি। নদী আর নৌকা, বৃষ্টি আর বন্যা এসব আমাদের নিত্যসঙ্গী।
এদেশের মানুষের জীবনে পানি যে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী, অতি সাধারণ যে পানি সে কিন্তু আদতে এক অতি অসাধারণ পদার্থ। তার কতকগুলো বিশেষ গুণের জন্যেই আমাদের জীবনের ওপর পানির এমন বিপুল প্রভাব।

যেমন দেখ, জীবন ধারণের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক যে তাপমাত্রা, অর্থাৎ যতটা কম বা বেশি তাপমাত্রা জীবনের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী তাতে পানি থাকে তরল অবস্থায়। এমনি তাপমাত্রায় পানি তরল থাকে বলেই

বাংলাইন্টারনেট.কম

দেহের ভেতর সম্ভব হয় জটিল রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ। লোহাও নির্দিষ্ট তাপে তরল হয়; কিন্তু সে ঝলসানো তাপে কোন জীবন বাঁচবে না। নির্দিষ্ট তাপে তরল হয় হাইড্রোজেন গ্যাসও; কিন্তু এমন ঠাণ্ডা জীবনের জন্যে অসহ্য।

দ্বিতীয় ঃ পানি ঠাণ্ডা হয়ে জমবার আগে তার আয়তন বাড়ে, তার ফলে সে পানি ওজনে হালকা হয়ে ওপরে ওঠে। কাজেই পানির জমা শুরু হয় ওপর দিক থেকে। অর্থাৎ ওপরটা জমে বরফ হলেও নিচের দিকে তরল থেকে যায়। আর সব তরল পদার্থের মতো পানি যদি জমে ভারি হত তাহলে বরফ তলিয়ে যেত পানির নিচে। আর এমনি করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাগর-মহাসাগর জমে বরফ হয়ে যেত।

তৃতীয় ঃ আর সব তরল পদার্থের তুলনায় পানি তাপ আটকে রাখতে পারে বেশি। তার ফলে পানিতে যে তাপ আটকে থাকে তা দিনে-রাতে হাওয়ার তাপমাত্রার পার্থক্য তেমন বাড়তে দেয় না।

চতুর্থ ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণের পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে যতটা তাপের দরকার এমন আর কোন তরল পদার্থের নয়। এই জন্যেই শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার উপক্রম হলে আমাদের শরীর থেকে পানি বাষ্প হয়ে (অর্থাৎ শরীর ঘেমে) যথেষ্ট তাপ খরচ হয়, আর তাতে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। সাধারণ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টায় আমাদের শরীর থেকে নিঃশ্বাসের সাথে প্রায় পোয়া কেজি থেকে আধ কেজি আর চামড়া দিয়ে আরো আধ কেজি থেকে দেড় কেজি পানি বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুকনো গরম আবহাওয়ায় শক্ত শ্রমের কাজ করলে ঘণ্টায় আধ কেজি পর্যন্ত এভাবে বাষ্প হয়ে যেতে পারে।

পঞ্চম ঃ পারদ ছাড়া পানির মতো এমন তাপ পরিবহনের ক্ষমতা আর কোন তরল পদার্থের নেই। কাজেই পানিতে এক জায়গায় তাপ লাগলে সেটা অতি তাড়াতাড়ি সারাটা পানিতে ছড়িয়ে পড়ে।

সবশেষে ঃ পানি যেমন অজস্র রকম জিনিসকে কিছু না কিছু গলিয়ে ফেলতে পারে এমন আর কোন পদার্থ পারে না। তার ফলে পানি হল জীবনের জন্যে দরকারী সব খাবার-দাবার সারা শরীরে বয়ে নেবার এক আশ্চর্য উপযোগী মাধ্যম।

বাংলাইন্টারনেট.কম

পৃথিবীতে মোট যত পানি আছে তার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগই আছে সাগর আর মহাসাগরে। তবে এই পানি নোনতা, খাবার অযোগ্য। বাকি যে শতকরা ৩ ভাগ পানি, তারও তিন-চতুর্থাংশ আটকে রয়েছে মেরুতে বরফের পাঁজায় আর উঁচু পাহাড়-পর্বতে কঠিন বরফের আকারে। এর পর যা বাকি থাকে তারও খুব সামান্য অংশ আছে মাটির ওপরে—বেশির ভাগ রয়েছে মাটির তলায়।

পৃথিবীর ওপরকার পানি যদি সব বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যেত তাহলে ভালই হত। কিন্তু তা তো নয়, এর সবটাই প্রায় অবিশুদ্ধ পানি। সবচেয়ে বিশুদ্ধ অবশ্য বৃষ্টির পানি। এতে অন্যান্য জিনিস গলন্ত অবস্থায় থাকে মাত্র এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। নদীর পানিতে গলন্ত বস্তু থাকে প্রতি লক্ষ ভাগে ৫০ ভাগের কাছাকাছি। তবে কোন কোন নদীর দূষিত পানিতে ২০০ ভাগ বা তারও বেশি থাকতে পারে। সমুদ্রের পানিতে গলানো অবস্থায় থাকে অসংখ্য নানা ধরনের লবণ। তার পরিমাণ প্রতি লক্ষ ভাগে প্রায় ৩,৫০০ ভাগ—অর্থাৎ শতকরা সাড়ে তিন ভাগ।

সুদূর অতীতে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম। আর তখন মোটামুটি বিশুদ্ধ পানির পরিমাণ ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আজ দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তাই যেমন দেখা দিয়েছে জমি-জমার অভাব, তেমনি দেখা দিচ্ছে পানিরও অভাব। মানুষ ক্রমেই চাষবাসের জন্যে, কলকারখানার জন্যে বেশি পানি ব্যবহার করছে, দূষিত করে তুলছে নদীনালার পানি, হ্রদ আর সাগরের পানি। ফারাক্কার মতো বাঁধের ফলে কোথাও কোথাও শুকিয়ে উঠছে নদীনালা।

আজকে পৃথিবীতে লোক যত, আর মাত্র ত্রিশ বছরে সংখ্যা দাঁড়াবে তার দ্বিগুণ। অথচ এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে পানির সরবরাহ বাড়বার কোন আশা নেই। বরং আরো বেশি করে দূষিত হবে নদী-নালার পানি। কলকারখানা, চাষবাস, যাতায়াত, মানুষের রোজকার নানা কাজে ব্যবহারের জন্যে পানির দরকার হবে আরো বেশি।

তাই, শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়েই আজ চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে ঃ কি করে পানি দূষিত হওয়া বন্ধ করা যায়। কি করে সবার দরকার মিটিয়ে পানি আরো ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। কি করে অপচয় বন্ধ করে বাঁচানো যায় পানি-সম্পদকে। কি করে সব জায়গায় পানি পাওয়া

যায় ঠিকমতো, সময়মতো, আর উপযুক্ত পরিমাণে।

এই পর্যন্ত কথা হতে হতে নাবীল একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে ঃ আচ্ছা, মরুভূমির দেশে তো নাকি পানি পাওয়া খুবই শক্ত। সেখানে কি করে হয় গাছপালা, চাষবাস? কি খেয়ে বাঁচে জীবজন্তু?

দেখলাম প্রশ্নটা সত্যি ওকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। বললাম ঃ মরুভূমিতে সত্যি পানি পাওয়া যায় খুব সামান্য। কিন্তু সেখানকার গাছপালা, জীবজন্তু সবই সেই সামান্য পানিকে খুব যত্নের সাথে ব্যবহার করতে শিখেছে।

যেমন ধর, তরমুজের মধ্যে পানি প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ। অথচ কারাকুম মরুভূমির পশ্চিম অঞ্চলে জন্মায় প্রচুর তরমুজ—তার জন্যে খেতে মোটেই পানি দিতে হয় না। দূর সাগর থেকে যে বাষ্প ভেসে আসে তাতেই রাতের বেলা বালি ভিজে ওঠে আর গাছপালা এই পানি শুষে নেয়।

মরুভূমির বেশির ভাগ জীবজন্তু কি করে কম পানি খেয়ে, এমন কি একেবারে পানি না খেয়ে, চলা যায় তার নানা কৌশল রপ্ত করেছে। তাদের বেশির ভাগই চলাফেরা করে রাত নামলে—দিনের বেলা রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্যে কাটায় মাটির তলায় গভীর, ঠাণ্ডা গর্তে। অনেক জন্তু পানি সংগ্রহ করে সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে।

তাছাড়া সব জীবজন্তুই রাসায়নিক উপায়ে শরীরের মধ্যেও কিছুটা পানি তৈরি করে। এক কেজি শ্বেতসারশর্করা হজম করতে তৈরি হয় প্রায় আধকেজি পানি; এক কেজি চর্বি হজম করতে পানি তৈরি হয় এক কেজির ওপর। অনেক জীবজন্তুর বেলায় এভাবেই বেশির ভাগ পানি তৈরি হয়। আর এজন্যে তাদের শরীরে শ্বেতসারশর্করা বা চর্বি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে। শরীরে শ্বেতসারশর্করা বা চর্বি হজম হয়ে যেমন পানি তৈরি হয়, তেমনি হয় শক্তি; কাজেই তাদের চলাফেরা কাজকর্ম চলে এই শক্তিতে। যেমন উট তার কুঁজের মধ্যে আশি কেজি থেকে একশো কেজি পর্যন্ত চর্বি জমিয়ে রাখতে পারে। তার ফলে পানি একদম না খেয়েও উট কাটিয়ে দিতে পারে দেড় মাস পর্যন্ত।

এবার মিনু বলল ঃ দুনিয়ায় খাবার পানি যদি ক্রমে ক্রমে খুব কমে আসে তাহলে মরুভূমির জীবজন্তুর কাছ থেকে এমনি সব কায়দা-কৌশল এবার থেকে হয়তো মানুষকেও শিখে নিতে হবে!

হাওয়ায় হাওয়ায়

আমরা সবাই বাস করছি এক বিরাট সমুদ্রের তলায়। এই সমুদ্র ঘিরে আছে আমাদের সবাইকে, আমাদের আশেপাশে সব কিছুকে। শুনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে কথাটা। কিন্তু সত্যি তাই। আমাদের চারপাশের এই সমুদ্র হল হাওয়ার সমুদ্র।

আমাদের মাথার ওপরে দু'শো মাইল কি তারও বেশি দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে হাওয়ার সমুদ্র। অথচ আমরা সেটা মোটেই বুঝতে পারি নে। তার কারণ, আমাদের চারপাশের শূন্য জায়গাগুলো যে হাওয়া দিয়ে ভর্তি তা তো আর চোখে দেখবার উপায় নেই! কিন্তু চোখে দেখা না গেলেও হাওয়ার অস্তিত্ব নানাভাবে বোঝা যায়।

বাংলাইন্টারনেট.কম

গাছের পাতা, ডালপালা নড়ে হাওয়া বয় বলেই। যখন জোরে হাওয়া বয় তখন চোখেমুখে লাগে হাওয়ার তোড়। ঝড় উঠলে হাওয়া উড়িয়ে নেয়

ধুলোবালি, ঝরা পাতা, কাগজের টুকরো —
এমনি সব হালকা জিনিস। কখনো কখনো ঝড়ের তোড়ে ভাঙ্গে গাছের ডালপালা, মানুষের বাড়িঘর; উড়ে যায় টিনের চাল।

পানি ভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে একটা খালি কাচের গ্লাস উপুড় করে ডুবিয়ে দাও। দেখবে কাচের গ্লাসে সামান্য একটু পানি ঢুকবে, কিন্তু মনে হবে বাকি গ্লাসটা যেন খালিই আছে। আসলে গ্লাসের ভেতরকার হাওয়া ওপর থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে বলেই গ্লাসে আর পানি ঢুকতে পারছে না। গ্লাসটা এবার একটু কাত করলেই হাওয়ার বুদবুদ বেরোতে শুরু করবে আর সেই খালি জায়গায় গিয়ে ঢুকতে থাকবে পানি।

এই হাওয়ার বুদবুদ আসলে কতকগুলো গ্যাসের মিশেল। তার বেশির ভাগই হল নাইট্রোজেন গ্যাস—আয়তনের দিক দিয়ে শতকরা ৭৮ ভাগ; ২১ ভাগ হল অকসিজেন গ্যাস।

আর সামান্য পরিমাণে থাকে আরগন, কার্বন ডাই-অকসাইড এমনি কতকগুলো গ্যাস। এর মধ্যে অকসিজেন গ্যাসটা মানুষ আর সব রকম জীবজন্তু, গাছপালার শ্বাসের জন্যে দরকারী। এই গ্যাস ছাড়া কোন কিছু জ্বলতেও পারে না।

হাওয়া পানিতে খানিকটা গলে যায়। অর্থাৎ হাওয়ার গ্যাসের অণুগুলো জায়গা করে নেয় পানির অণুর ফাঁকে ফাঁকে। একটা গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে রেখে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে গ্লাসের গায়ে আর পানির ধারে ধারে খুব ছোট অসংখ্য বুদবুদ জমেছে। গরম পানির চেয়ে ঠাণ্ডা পানিতে হাওয়া গলে থাকে বেশি। তাই ঠাণ্ডা পানি গরম হয়ে উঠলে তার ভেতরকার গলে থাকা হাওয়া বেরিয়ে এসে অমনি বুদবুদ তৈরি করে। ঠাণ্ডা পানি খেতে মিষ্টি, অথচ ফোটানো পানি খেতে বিস্বাদ লাগে। তাতে বোঝা যায় পানিতে গলে থাকা হাওয়ার জন্যেই সেটা আমাদের কাছে মিষ্টি লাগে। ফোটালে পানি থেকে সব হাওয়া বেরিয়ে যায়, তাই সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাদও চলে যায়।

বাংলাইন্টারনেট.কম

হাওয়া চাপ দেয়। কথাটা শুনলে প্রথমটায় হয়তো অদ্ভুত লাগবে। হাওয়া এমন হালকা জিনিস, তার চাপ আর এমন কি হবে! কিন্তু হাওয়ার কণারা

অনবরত দাপাদাপি করছে। কোন জিনিস কাছে থাকলেই তার ওপর প্রতিটি হাওয়ার কণা যেন ঘুষি মারতে থাকে। এমনি লক্ষ কোটি কণার ঘুষি মিলেই তৈরি হয় হাওয়ার চাপ। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বেলুনে ফুঁ দিয়ে হাওয়া পুরেছ। তারপর বেলুনের মুখটা ছেড়ে দিলেই দেখেছ বেলুন থেকে কেমন জোরে হাওয়া বেরিয়ে যায়। হাওয়ার চাপের জন্যেই এমন হয়।

আমাদের ওপরে রয়েছে বহু দূর ছড়ানো হাওয়ার সমুদ্র। কাজেই হাওয়া আমাদের ওপরও চাপ দিচ্ছে। এই চাপ কিন্তু একেবারে ফেলনা নয়। সমুদ্র-সমতলে এক বর্গ সেন্টিমিটার জায়গার ওপরে হাওয়ার চাপ প্রায় এক কিলোগ্রাম। নাবীলের হাতের পাতার ওপরকার মাপ মোটামুটি ৮০ বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে হিসেব করলে দেখা যাবে ওর শুধু হাতের পাতার ওপরই হাওয়ার চাপ প্রায় আশি কেজি (অর্থাৎ দু'মণের ওপরে)। তাহলে এখন বোঝ আমাদের সারা শরীরের ওপর হাওয়া কত টনের চাপ দিচ্ছে। ভাগ্যিস, আমাদের শরীরের ভেতরের কোষে কোষে হাওয়া আছে; তাই বাইরের চাপে আর ভেতরের চাপে কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে। নইলে হাওয়ার প্রচণ্ড চাপে আমাদের দফা রফা হয়ে যেত।

হাওয়ার চাপকে আরেকভাবেও দেখা যেতে পারে। মনে কর তোমার হাতে নিয়েছ পাঁচখানা বই। বইগুলো তোমার হাতের ওপর চাপ দিচ্ছে; যদি এবার একই বই নাও দশখানা, তাহলে তাদের ওজন হবে দ্বিগুণ আর তোমার হাতের ওপর চাপও বেড়ে হবে আগের ডবল। আমাদের ওপর হাওয়ার চাপ হল ওপরকার সব হাওয়ার স্তূপের ওজনের ফল। পানির চাপও এই রকম। পানির যত নিচে যাওয়া যায়, ওপরকার পানির ওজন বা পানির চাপ তত বাড়ে।

বইয়ের চাপ পড়ে শুধু নিচের দিকে। পানির আর হাওয়ার চাপ পড়ে সব দিকেই। তাছাড়া হাওয়া বায়বীয় জিনিস বলে ওপরকার হাওয়ার চাপে নিচেকার হাওয়ার ঘনত্ব বাড়ে। তাই পৃথিবীর ওপর আমাদের কাছাকছি হাওয়া কিছুটা ঘন। ওপর দিকে যত ওঠা যায় হাওয়া তত হালকা হয়। তার ফলে সমুদ্রতল থেকে মাত্র ছ' সাত হাজার মিটার ওপরে উঠলেই হাওয়ার চাপ অর্ধেকেরও বেশি কমে যায়।

বাংলাইন্টারনেট.কম

হাওয়া কেবল নিচের দিকেই নয়, ওপরের দিকেও যে চাপ দেয় সেটা খুব সহজেই দেখানো যেতে পারে। একটা গ্লাসে কানায় কানায় ভর্তি করে পানি নাও। তারপর তার খোলা মুখে একটা কার্ডবোর্ড চাপা দাও—পানি যেন পড়ে না যায়। বোর্ডটাকে শক্ত করে চেপে ধরে গ্লাসটা সাবধানে উপুড় করে ফেল। এবার কার্ডবোর্ডটাকে দাও ছেড়ে। অবাক কাণ্ড! গ্লাসের পানি পড়ছে না। কার্ডবোর্ডের ওপর হাওয়ার চাপ গ্লাসসুদ্ধ পানিকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

তোমাদের হয়তো মনে হবে পৃথিবীর বাইরে সারা মহাকাশ জুড়েই বুঝি পৃথিবীর মতো হাওয়া রয়েছে। তা কিন্তু মোটেই সত্যি নয়। হাওয়ার স্তরটা পৃথিবীর চারপাশে তার আকর্ষণের টানে বাঁধা। পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে হাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে। পৃথিবীতে হাওয়া থাকার জন্যে শুধু যে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসেরই সুবিধে হচ্ছে তা নয়। পৃথিবীর চারপাশে হাওয়ার আবরণ মহাশূন্যের নানা বিপদ-আপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

পৃথিবীতে যদি হাওয়া না থাকত তাহলে সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই তার প্রবল কিরণ আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিত। আর প্রচণ্ড তাপে পৃথিবীর কোথাও কোথাও তাপ চড়ে হতো দু'শো আড়াইশো ডিগ্রী। হাওয়ার আস্তরণের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে সূর্যের আলো আর তাপ অনেকটা মোলায়েম হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছায়। তাই সম্ভব হয় পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালার বেঁচে থাকা।

হাওয়ার আস্তরণ আবার রাতের বেলা সূর্যের তাপ অনেকখানি আটকে রাখে। প্রবল শীতের রাতে লেপকাঁথার আবরণ যেমন আমাদের শরীরের তাপ আটকে রাখতে সাহায্য করে অনেকটা তেমনি। হাওয়ায় ঢাকা না থাকলে সূর্য ডোবার সাথে সাথেই পৃথিবীর তাপ পালিয়ে যেত মহাশূন্যে; আর তাপ নেমে যেত শূন্যের নিচে দু'শো আড়াইশো ডিগ্রীতে। পৃথিবীর ওপর হাওয়ার চাঁদোয়া থাকার জন্যেই ঠাণ্ডা-গরমের তীব্রতা কম হয়।

এছাড়া রয়েছে মহাকাশ থেকে দিন-রাত ছুটে আসা কোটি কোটি উল্কা কণা। খুব ছোট ছোট কণাগুলো হাওয়ার স্তরে ঘষা লাগে সাথে সাথেই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বড় উল্কার পিণ্ডগুলো জ্বলে-পুড়ে কিছুটা ছোট হয়ে

বাংলাইন্টারনেট.কম

পৃথিবীতে পড়ে লোহা বা পাথরের পিণ্ড হিসেবে। হাওয়ার আবরণ না থাকলে এগুলো দিনরাত ঝাঁঝরা করে দিত পৃথিবীর ওপরকার সবকিছু। চাঁদের ওপর হাওয়ার ঢাকনা নেই। তাই চাঁদের ওপরকার মাটি ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে এমনি কোটি কোটি উল্কাকণার বর্ষণে।

ভাগ্যিস আমরা হাওয়ার সমুদ্রে ডুবে আছি! তা নইলে পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বই কি থাকত?

বাংলাইন্টারনেট.কম

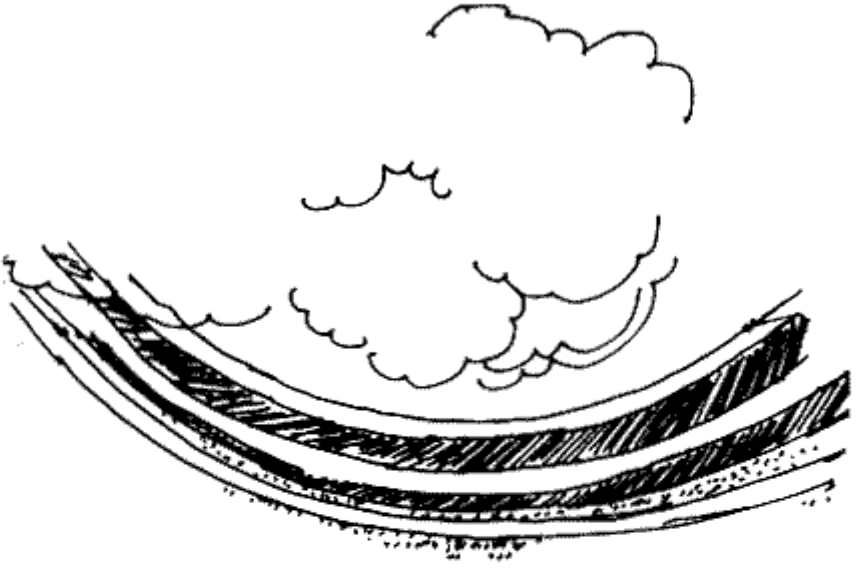

রঙধনু কেন ওঠে?

ক'দিন থেকে অনবরত বৃষ্টিতে আমরা সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আজ বিকেলে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, বাইরে বেরোবার সময় ছাতা নেব কিনা ভাবছি, এমন সময় নানার দরাজ গলা শোনা গেল ঃ "ওরে দেখ, দেখ, আর বৃষ্টি হবে না। পুবের আকাশে রঙধনু দেখছি।"

বারান্দায় নেমে তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই। ভারী উজ্জ্বল একটা রঙধনু আকাশ জুড়ে ঝলমল করছে। কোথাও আর কালো মেঘের দেখা নেই। সারাটা আকাশ যেন রোদের আলোয় খিলখিল হাসিতে মেতে উঠেছে। রঙধনু আকাশে আগেও অনেক দেখেছি। কিন্তু রঙধনু দেখে নানা কি করে বুঝলেন আর বৃষ্টি হবে না একথা ভেবে মনে বড় খটকা লাগল। থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম ঃ "আচ্ছা নানা, বৃষ্টি হবে না এ কথার ওপর তুমি বাজি ধরতে রাজি তো।"

বাংলাইন্টারনেট.কম

নানাও মনের জোরে নেহাত কম যান না। বললেন ঃ "আলবত। আলবত। এই রঙধনুর এককালে নাম ছিল 'ইন্দ্রধনু'। কেন বলতে পারবি? লোকে ভাবত বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র বৃষ্টি দেবার পর তাঁর ধনুকটাকে আকাশে খোলা-মেলা রোদে শুকোতে দেন। তাই তারা এর নাম দিয়েছিল ইন্দ্রধনু। তাহলে দেখলি তো বৃষ্টি একদম ধরে না গেলে রঙধনু উঠতেই পারে না।"

বুঝলাম নানা গাঁজাখুরি গল্প দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাইছেন।

অবাক হবার ভান করে বললাম ঃ "নানা, তুমিও এসব গল্প বিশ্বাস কর? ইন্দ্রের ধনু কোথায়— ও তো আকাশে বৃষ্টির ফোঁটায় আলোর খেলা।"

নানাও পিছপা' হবার পাত্র নন। বললেন ঃ "আরো বোকা, হোক সে আলোর খেলা, কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে রঙধনু দেখে দেখে মানুষ এটা তো ঠিকই বুঝেছে যে, বৃষ্টি শেষ হয়ে যাবার পরেই ওটা আকাশে ওঠে। এর মধ্যে তো আর ফাঁকির ব্যাপার কিছু নেই।"

নানার কথাটা ফেলতে পারলাম না। সত্যি তো, মানুষ বহু বছর ধরে দেখে দেখে শিখেছে বৃষ্টির পর রঙধনু ওঠে। তার চেহারাটাও ধনুর মতো বাঁকানো। এর সাথে কল্পনার রঙ চড়িয়ে যোগ হয়েছে ইন্দ্রের কাহিনীটা।

আসলে কিন্তু তুমি আমি সবাই পারি রঙধনু তৈরি করতে! দরকার শুধু এক গাল ভর্তি পানি, আর কিছু না।

গাল ভর্তি পানি নিয়ে দাঁড়াও খোলা জায়গায়, আকাশে যে দিকে সূর্য আছে তার উলটো দিকে মুখ করে। তারপর 'ফু' করে শূন্যের দিকে জোরে ছুঁড়ে দাও তোমার মুখের পানি। পানিগুলো অসংখ্য ছোট ছোট গুঁড়ো হয়ে ভাসতে থাকবে শূন্যে। আর অবাক কাণ্ড! সেই রাশি রাশি পানির কণার মধ্যে দেখবে রঙধনু ভাসছে।

এ থেকেই বুঝবে রঙধনু তৈরির জন্যে দরকার কড়া সূর্যের আলো আর আকাশে গুঁড়ো গুঁড়ো বিশুদ্ধ পানির কণা। বৃষ্টি হয়ে যাবার ঠিক পরপর আকাশে এ ধরনের প্রচুর পানির কণা ভাসতে থাকে। আর এজন্যেই ঠিক

বাংলাইন্টারনেট.কম

বৃষ্টির পরপরই আকাশে রঙধনু ওঠে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, আকাশে সূর্য যে পাশে থাকে রঙধনু ওঠে তার উলটো
দিকে। অর্থাৎ সকালবেলা সূর্য পুব দিকে থাকে বলে রঙধনু দেখা দেয় পশ্চিমের আকাশে, আর বিকেলে সূর্য থাকে পশ্চিমে, তাই রঙধনু ওঠে পুব দিকে।

আচ্ছা, না হয় বুঝলাম পানির কণা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে ফিরে এলো। কিন্তু তার এমন সাতরঙা বাহার তৈরি হয় কি করে?

একটা তেশিরা কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোর দিকে তাকালে দেখবে সূর্যের সাদা আলো ভেঙ্গে সাত রঙে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের সাদা রঙের আলোতে আছে নানা মাপের আলোর ঢেউ। নানা মাপের আলোর পথ কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় নানাভাবে বেঁকে যায়। তাই রঙগুলো আলাদা আলাদা হয়ে পড়ে। সূর্যের আলো আকাশে পানির কণার মধ্যে ঢুকে যখন আবার বেরিয়ে আসে তখনও নানা মাপের ঢেউ-এর পথ নানাভাবে বেঁকে যায়। তাই সেখানেও সূর্যের সাদা আলো সাতরঙা বর্ণালীতে ভাগ হয়ে যায়।

এই ঠিকরে আসা আলোর পথ এমনভাবে সরে যায় যে, সবটা আলো মোটামুটি ৪২° ডিগ্রী কোণ করে আমাদের চোখে পড়ে। তাই এই সাতরঙা আলোর ঝালরকে আমরা একটা গোল বৃত্তের আকারে দেখি। অবশ্য সচরাচর বৃত্তের ওপর দিকের ধনুকের মতো অংশটাই শুধু আমরা দেখতে পাই। উড়োজাহাজে চড়ে বা পাহাড়ের ওপর উঠে বিশেষ অবস্থায় পুরো বৃত্তটাই দেখা যায় ময়ূরের পেখমের মতো।

এমনি সাতরঙা পুরো বৃত্ত যদি আকাশে সব সময়ে সব জায়গা থেকেই দেখা যেত, কী মজাই যে হত তা হলে!

বাংলাইন্টারনেট.কম

মেঘেরা কি করে আকাশে ভেসে থাকে

এবার আমি দেখছি একটা হাতি। হাতিটার চারটে পা। মস্ত বড় শুঁড়। হাতিটা দেখতে দেখতে হয়ে গেল একটা ঘোড়া। না, না—ঘোড়া তো নয়, এ একটা ভালুক।

আমি কিন্তু দেখছি একটা পাল-তোলা নৌকা। নৌকাটা ছুটে চলেছে বিরাট এক ঢেউ-খেলানো সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

সমুদ্রটা ছিল সাদা। কিন্তু এবার ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে লালচে। নৌকাটাও ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে উঠল।

—আসলে কিন্তু এগুলো হাতি, ঘোড়া, নৌকা, সমুদ্র কিছুই নয়। এ সবই হল আকাশে মেঘের খেলা।

বিকেলের নীল আকাশ জুড়ে ছুটে চলেছে মেঘের দল। পলে পলে বদলাচ্ছে তাদের আকার। মিনু, ঝিনু, নাবীল, সাধীল বসে বসে তার মধ্যে দেখছে নানা চেহারা।

বাংলাইন্টারনেট.কম

মিনু ওদের মধ্যে বড়। হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ আচ্ছা, বল দেখি মেঘগুলো ভেসে থাকে কি করে?

ঝিনু সবার আগে মুখ খোলে ঃ এ আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি? হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। মেঘেরা, হাওয়াতেই ভেসে থাকে ওরা।

নাবীল ওদের মধ্যে সবার ছোট। বয়স ছ'বছর মোটে। সেও কম যায় না। বলল ঃ বাহ্! আমরা পানি ভেসে থাকি না বুঝি! মাছ পানিতে ভেসে থাকে না? মেঘেরাও ভেসে থাকে অমনি করে।

মিনু উড়িয়ে দিতে চায় ওর কথা ঃ দূর বোকা ! মেঘ কি মানুষ? মেঘ কি মাছ?

আমি বসেছিলাম একটু দূরে। নাবীলের কাঁদো কাঁদো চেহারা দেখে এবার এগিয়ে আসতে হল।

বললাম ঃ আচ্ছা, তোমরা কুয়াশা দেখেছ কে কে? ওরা ক'জনেই বলল দেখেছে। এই তো সেদিনও সবাই ভোরে ঘুম ভেঙ্গে দেখে চার দিন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা কণা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। দূরের জিনিস তাতে মোটেই স্পষ্ট দেখা যায় না। চারদিকে সব কিছু ভেজা সপ্‌সপে। অর্থাৎ এগুলো পানির কণা— ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়।

এই কুয়াশাই হল আসলে মেঘ। পানির কণা যখন থাকে মাটির কাছাকাছি তখন তাকে আমরা বলি কুয়াশা। আর যখন এগুলো ওঠে আকাশের ওপরে তখন তাদের বলি মেঘ। উঁচু পাহাড়ের ওপরে কোথাও গেলে দেখা যাবে আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘের দল। পাঁজা পাঁজা কুয়াশার মতো। জানালা খোলা রাখলে ঢুকে পড়বে ঘরের ভেতরে। ভিজিয়ে দেবে ঘর-দোর, কাপড়-চোপড় সব কিছু।

এখন দেখা দিচ্ছে দুটো প্রশ্ন।

প্রথম পানির কণারা কি করে ঢোকে হাওয়ায়?

দ্বিতীয়, ঢুকল যদি তারপর তারা কি করে ওঠে আকাশের ওপর?

এই দুটো প্রশ্নের জবাব জানতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, পৃথিবীর ওপর আমরা বাস করছি এক বিরাট সাগরের তলায়। এই সাগর হল হাওয়ার সাগর। হাওয়ার রেশ আছে পৃথিবীর ওপর প্রায় আটশো কিলোমিটার

পর্যন্ত। পৃথিবীর কাছাকাছি এই হাওয়া ঘন, ওপরের দিকে ক্রমে ক্রমে হয়ে যায় হালকা। অর্থাৎ হাওয়ার চাপে পৃথিবীর কাছে হাওয়ার কণাগুলো হয়ে থাকে কাছাকাছি, ঠাসাঠাসি। ওপর দিকে হাওয়ার কণারা ছড়িয়ে থাকে দূরে দূরে।

পৃথিবীর আশেপাশে যেসব হাওয়ার কণা সেগুলো কাছাকাছি ঠাসা থাকাতে তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় বেশি। তাছাড়া পৃথিবীর ওপর মাটি পাথর বাড়িঘর গাছপালার গায়ে সূর্যের কিরণ পড়ায় এসব তেতে ওঠে। এই তাপের ছোঁয়া পেয়ে হাওয়ার কণাদের ছুটোছুটি আরো বেড়ে ওঠে। কণাদের ছুটোছুটি বেশি হলেই তাকে আমরা বলি তাপ বেশি হওয়া। অর্থাৎ পৃথিবীর কাছাকাছি হাওয়া হল গরম। আর অনেক উঁচুতে উঠলে সেখানে হাওয়ার কণাদের ঠোকাঠুকি কম। তাই সেখানে রীতিমতো ঠাণ্ডা।

শুকনো হাওয়া পানির কণা শুষে নেয়। তাই হাওয়ায় কিছু-না-কিছু পানির কণা সব সময়েই রয়েছে। তবে সচরাচর সে কণা থাকে অদৃশ্য বাষ্পের আকারে। সে পানিকে আমরা দেখতে পাইনে।

পুকুরের বুকে মনে হবে পানি আছে স্থির হয়ে। কিন্তু আসলে এই স্থির পানিতেও পানির কণারা কিছুটা ছুটোছুটি করছেই। দুপুরের তাতানো রোদে পানির ওপর পড়ে সূর্যের তেজ। এই তেজ লুফে নিয়ে পানির ওপরকার কণাদের ছুটোছুটির পরিমাণ যায় বেড়ে। কতকগুলো কণা এত জোরে লাফাতে শুরু করে যে পুকুরের বাঁধন কাটিয়ে একেবারেই লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। তারপর এসব বাষ্পের কণা ভেসে বেড়াতে থাকে হাওয়ার কণাদের গায়ে ভর দিয়ে। তরল অবস্থায় পানি হাওয়ার চেয়ে অনেক ভারি। কিন্তু পানির বাষ্প হাওয়ার চেয়ে হালকা। তাই ভাসে হাওয়ার বুকে।

কেতলি বা কড়াইতে পানি নিয়ে যদি চুলায় জ্বাল দেওয়া যায় তাহলে চুলার আগুনের তাপে পানির কণার ছুটোছুটি বাড়তে থাকে। শেষটায় তাপমাত্রা যখন একশো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায় তখন ভক্ ভক্ করে পানির কণা ভেসে উঠতে থাকে হাওয়ার বুকে। আমরা তখন বলি পানি 'বলক দিয়েছে'।

বাংলাইন্টারনেট.কম

বলক দিতে দিতে কেতলির পানি ফুরিয়ে যায়। খরার দিনে পুকুরের পানি

উবে গিয়ে পুকুর হয়ে দাঁড়ায় শুকনো খট্‌খটে। ভেজা কাপড় রোদে মেলে দিলে খানিক পরে সে কাপড় শুকিয়ে যায়। কোথায় গেল এসব পানি? সব গিয়ে ঢুকেছে হাওয়ায়। এমনি পানির বাষ্প হাওয়ায় ঢুকছে সারা বছর। পুকুর থেকে। নদী-হ্রদ-সাগর থেকে। গাছপালার পাতা থেকে। সব ভেজা জিনিস থেকে। সারাক্ষণ পানিতে কিছু-না-কিছু বাষ্প আছেই।

তা বলে সারা বছর হাওয়ায় পানির পরিমাণ এক রকম থাকে না। শীতের দিনে তাপ কম। তার ওপর উত্তরের পাহাড়ী এলাকা থেকে বইতে থাকে শুকনো, ঠাণ্ডা হাওয়া। এই হাওয়ায় বাষ্প থাকে খুব কম। তাই ভেজা কাপড় মেলে দিলে শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। গরমের দিনে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে আসে ভেজা মৌসুমী হাওয়া। তাছাড়া গরমে পানির কণার ছুটোছুটি হয় বেশি। পানি থেকে বেশি বাষ্প ভেসে ওঠে হাওয়ায়। তাই তখন হাওয়া হয়ে ওঠে ভেজা, স্যাঁতসেতে, ভ্যাপ্‌সা রকমের।

মনে কর পানি থেকে বাষ্পের কণা ভেসে উঠল হাওয়ায়। তারপর কি হয় তাদের?

একটা বাতির ওপর হালকা কাগজের কুচি ফেললে দেখবে সেগুলো ওপর দিকে ছুটতে থাকে; তার কারণ গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে হালকা। গরম হাওয়া তাই ওপর দিকে উঠতে থাকে। তার সাথে সাথে উঁচুতে ওঠে হাওয়ায় ভেসে থাকা পানির সব অদৃশ্য কণা অর্থাৎ বাষ্প।

আগেই বলেছি ওপরকার হাওয়া ঠাণ্ডা। ওপরে উঠলে এই ঠাণ্ডায় বাষ্পের কণার ছুটোছুটি কমে আসে। হাওয়ায় সব সময়েই কিছু না কিছু ধুলো বা ধোঁয়ার কণা ভেসে থাকে। এমনি কোটি কোটি ধুলোর কণার গায়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাষ্পের কণা জমতে থাকে। তৈরি হয় অসংখ্য কুয়াশার মতো মেঘের বিন্দু। সূর্যের আলো ঠিকরে আসে এই কণা পানির গা থেকে। তাই আমরা মেঘকে দেখতে পাই ভেসে যেতে।

ঠাণ্ডা বেশি হলে এই মেঘের কণাদের গায়ে গায়ে জমে আরো বাষ্প। কখনো কখনো এলোমেলো হাওয়ায় মেঘের কণারা একে অন্যের গায়ে ঠোকাঠুকি খেয়ে জোড়া লেগে যায়। মেঘের পানির কণা তখন ভারি হয়ে ওঠে। সূর্যের আলো আর মেঘ ভেদ করতে পারে না। তাই সে মেঘ দেখায়

বাংলাবই.ইনফো.কম

কালো। আর সচরাচর পানিভর্তি এমনি কালো কালো মেঘ থেকে নামে বৃষ্টি। বর্ষার দিনে বঙ্গোপসাগরের ওপর থেকে প্রচুর বাষ্প নিয়ে ভেসে আসে মৌসুমী হাওয়া। আর কালো দৈত্যের মতো মেঘের দল। এই মেঘের দলই এদেশে অঝোর ধারায় ঝরায় বর্ষার ঝমঝম বৃষ্টি।

শুধু পানি নয়। অনেক উঁচুতে যেসব মেঘ তাতে বেশি ঠাণ্ডায় কখনো কখনো পানি জমে হয় বরফের কণা। এসব বরফের কণাও হাওয়ায় ভর করে ভেসে বেড়াতে থাকে আকাশে। কখনো কখনো বরফের কণা বড় হয়ে তৈরি হয় শিল। বৃষ্টির সাথে এই শিল পড়তে থাকে মাটিতে।

এসব শোনার পর মিনু আস্তে বলল ঃ তাহলে দেখছি নাবীল তখন একেবারে বাজে কথা বলে নি। সত্যি সত্যিই মেঘেরা সাঁতরে যেতে থাকে হাওয়ার ওপর দিয়ে।

এতক্ষণে নাবীলের মুখে ফুটে উঠল এক টুকরো মিষ্টি হাসি।

আকাশে নানা আকারের নানা রঙের মেঘের খেলা দেখতে কার না ভাল লাগে? সকালে সন্ধ্যায় কখনো কখনো মেঘ দেখায় টকটকে লাল, কখনো কমলা, কখনো গোলাপী। বর্ষাকালে কখনো কখনো আকাশ জুড়ে দৈত্যের মতো বিশাল কালো মেঘ ছুটে আসে। মেঘের বুকে বজ্রের আলো ঝিলিক দেয়। কখনো আবার কালো মেঘের ফাঁকে অদ্ভুত এক আলোতে আলোকিত হয়ে ওঠে সব কিছু। মেঘের পাড় তখন দেখায় উজ্জ্বল রুপোলি।

শরতের আকাশে দেখা দেয় ছেঁড়াখোঁড়া সাদা মেঘ। উদাস হাওয়ায় গা মেলে দিয়ে উড়ে তারা চলে—সারি সারি পালতোলা নৌকার মতো। আবার উড়োজাহাজে চড়ে আকাশের ওপরে যদি ওঠ তাহলে দেখবে পাঁজা-পাঁজা তুলোর মতো মেঘের কী বিচিত্র সমারোহ। নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের কী অপরূপ সৌন্দর্য!

মেঘেরা কোথা থেকে পায় তাদের বিচিত্র রঙ, বিচিত্র চেহারা? দিনে দিনে কেমন করে বদলে যায় তাদের রূপ?

এ সব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের সবার আগে জানতে হবে আসলে মেঘ কি জিনিস। তারপর জানতে হবে নানা জিনিসের নানা

বাংলাইন্টারনেট.কম

মেঘের পাড় রূপোলি কেন?

রকম রঙ আমরা কেন দেখি। এরপর বুঝতে হবে নানা রকম মেঘের নানান ধরনের রঙ কি করে হয়।

প্রথম প্রশ্নের জবাব পাওয়া এমন শক্ত কিছু নয়। আমরা জানি, মেঘ হল পানির কণা। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পানির কণা বাতাসে ভেসে থেকে মেঘের জন্ম দেয়। তা-বলে যে কোন রকম পানির কণা হলেই চলবে না। কেননা হাওয়াতে কিছু-না-কিছু পানির কণা হর-হামেশাই ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলো আমরা দেখতেও পাইনে আর তাদের মেঘও বলি নে। আসলে মেঘ হল কিছুটা বড়সড় পানির কণা যাদের গা থেকে সূর্যের আলো, চাঁদের আলো বা আর কোন আলো ঠিকরে আসছে, তাই তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমনি আলো ঠিকরে এসে চোখে পড়ার জন্যে এক সাথে কাছাকছি থাকা চাই অনেক অনেক পানির কণা। তা নইলে মেঘ দেখা যাবে না।

বাংলাইন্টারনেট.কম

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবও কঠিন নয়। পৃথিবীতে আলোর প্রধান উৎস হল সূর্য। সূর্য থেকে আলোর ঢেউ এসে আমাদের চোখে পড়ে। সূর্যের আলো নানা জিনিসের ভেতর দিয়ে বা কোন জিনিসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে এসেও আমাদের চোখে পড়ে। সূর্যের যে আলোর ঢেউ তা আবার সব এক মাপের ঢেউ নয়। কোন ঢেউ বড় মাপের, কোন ঢেউ তার চেয়ে ছোট, কোনটা আরো ছোট। আমাদের চোখে সাড়া জাগাতে পারে এমনি সবচেয়ে ছোট মাপের ঢেউগুলোকে দেখি আমরা বেগুনি রঙের। সবচেয়ে বড় মাপের ঢেউগুলো আমাদের চোখে দেখায় লাল রঙের। এর মাঝে পড়ে আরো নানা মাপের নানা রঙের আলো ঃ নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ইত্যাদি। এই সব নানা রঙের আলো যখন আমাদের চোখে এক সাথে এসে পড়ে তখন সে আলো-কে আমরা সাদা দেখি। কোন কারণে যদি এর কোন রঙ হারিয়ে যায় বা কোনকিছুতে শুষে নেয় তাহলে বাকি আলোর রঙটাই আমরা দেখতে পাই।

পানির ঢেউ-এর সামনে যদি পড়ে একটা অতি ছোট বাধা তাহলে ঢেউ সে বাধা ডিঙ্গিয়ে যায়। কিন্তু বাধাটা যদি হয় ঢেউয়ের আকারের চেয়ে বড় তাহলে ঢেউ তাকে ডিঙ্গাতে পারে না—বাধার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়, ছিটিয়ে যায় চারদিকে! আলোর ঢেউ-এর বেলাতেও তেমনি। এমনিতে হাওয়ার ধুলোর কণারা এমন ছোট মাপের যে তার গায়ে অতি ছোট মাপের নীল আলোর ঢেউয়েরা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। বড় মাপের অন্য রঙের ঢেউয়েরা ছিটকায় শুধু হাওয়ার ভেতরকার ধুলোর কণা থেকে—বেশির ভাগই হাওয়ার কণাদের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে পেরিয়ে যায়। তাই ছিটকানো নীল আলোর জন্যে আকাশকে আমরা সচরাচর নীল দেখি।

সকালে বা সন্ধ্যায় হাওয়ার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো আমাদের কাছে আসে রীতিমতো তেরচা হয়ে। তাতে অনেকখানি হাওয়ার বাধা তাকে ডিঙ্গিয়ে আসতে হয়। তাতে ধুলোর কণাও পড়ে অনেক বেশি। আর এই লম্বা পথ পেরোতে গিয়ে বেগুনি, নীল, আসমানী এসব ছোট মাপের আলোর ঢেউ বেশির ভাগই ছিটকে হারিয়ে যায় মহাশূন্যে। মেঘের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বা মেঘকে ডিঙ্গিয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে যে সব ঢেউ তার অনেকটাই

লালচে রঙের। তাই সকালসাঁঝে মেঘ দেখায় লাল বা কমলা রঙের। আর এটা অনেকটা নির্ভর করে হাওয়ায় কি পরিমাণ ধুলো আছে ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলো ছিটিয়ে দেবার জন্যে আর আকাশে কি পরিমাণ মেঘ আছে তার ওপর।

মেঘ যদি হয় হালকা রকম আর তাতে পানির কণা হয় মাঝারি মাপের, তাহলে সে মেঘের গা থেকে সূর্যের আলো বেশি পরিমাণে ঠিকরে আসতে পারে। সূর্যের সব রঙের আলোই যদি ঠিকরে আসে তাহলে সে মেঘকে দেখায় সাদা। শরতকালে আকাশ জুড়ে এমনি মেঘের আনাগোনাই বেশি দেখা যায়।

আবার মেঘে পানির ফোঁটা যদি হয় বেশ বড় আকারের আর সে মেঘ যদি হয় রীতিমতো পুরু তাহলে তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো তেমন পৌঁছতে পারে না আমাদের কাছে। সে মেঘ তখন দেখায় কালো থমথমে। বর্ষার দিনে দেখি আমরা এমনি মেঘ। এমনি কালো মেঘ দেখলেই মনে হয় এই বুঝি বৃষ্টি এলো আকাশ ভেঙ্গে। এমনি এক একটি কালো মেঘে থাকতে পারে হাজার হাজার টন পানি।

কখনো মেঘের কিনারটা থাকে বাকি মেঘের চেয়ে হালকা। সেই হালকা মেঘের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসে সূর্যের ঝিকমিকে রোদ। তখন এই উজ্জ্বল ঝিকমিক রোদকে মনে হয় যেন মেঘের শাড়ির গায়ে রুপোলি পাড়। মেঘের রঙ যত গাঢ় হয় পাড়টা মনে হয় তত উজ্জ্বল। কিন্তু আসলে তো সবই পানির ফোঁটা আর সূর্যের আলোর ঢেউ-এর লুকোচুরি খেলা।

এমনি সব লুকোচুরি যদি না থাকত তাহলে কি পানসেই লাগত দুনিয়াটাকে!

বাংলাইন্টারনেট.কম

বজ্র হাসে মেঘের কোলো

বর্ষার দিনে মাঝে মাঝে গুরু গুরু ডাকের সাথে মেঘের বুকে ফুটে ওঠে তীব্র আলোর ঝলক। কোথা থেকে আসে এই আলোর ঝলক? কেমন করে তৈরি হয় এই গুরু গুরু আওয়াজ?

ঘন কালো মেঘের ফাঁকে আকাশে ঝিলিক দিয়ে যে আলো দেখা যায় তাকে আমরা বলি বিজলি চমকানো। বিজলি মানে তো হল বিদ্যুৎ। তবে কি শহরের ঘরে ঘরে যে বিদ্যুৎ আলো দেয় তেমনি বিদ্যুতেরই ঝলক দেখতে পাই আমরা আকাশে?

ঘরে ঘরে যে বিজলি আলো দেয় সে তো মানুষ 'পাওয়ার হাউজে' কয়লা, তেল বা গ্যাস পুড়িয়ে তৈরি করে, কিংবা তা আসে জলপ্রপাতের শক্তি থেকে। কিন্তু আকাশে যে বিজলি চমকায় তা আসে কোথা থেকে?

ভাবতে অবাক লাগে মানুষের তৈরি যেমন 'পাওয়ার হাউজ' আছে,

বাংলাইন্টারনেট.কম

তেমনি বিরাট 'পাওয়ার হাউজ' রয়েছে সারা আকাশ জুড়ে। আকাশময় হাওয়ার কণায় কণায় ছড়ানো আছে এই বিজলি তৈরির কারখানা। আর তাতে দিনরাত সারাক্ষণই তৈরি হচ্ছে বিজলি।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। শীতকালে অন্ধকার রাতে যদি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো চুলে চিরুনি চালাতে থাকে তাহলে দেখবে চুলে পট্ পট্ করে শব্দ হবে, আর খুদে খুদে আগুনের ফুলকিও দেখা যাবে! এই ফুলকিগুলো আর কিছু নয়—ছোট ছোট বিদ্যুতের ঝিলিক। চুল আর চিরুনির ঘষা থেকেই এই বিজলির ঝিলিক তৈরি হয়েছে।

কিন্তু মেঘের বুকে ঘষা লাগছে কিসে? সেখানে চুল আর চিরুনি নেই, কিন্তু বাতাসের কণারা অনবরত ঘষা খাচ্ছে মেঘের পানির কণার সাথে। আর তা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বিজলি। যখন একটা মেঘে প্রচুর পরিমাণে বিজলি জমা হয়ে যায় তখন তা লাফিয়ে নামে পৃথিবীতে। কখনো এক মেঘ থেকে যায় আরেক মেঘে। কখনো একই মেঘের থেকে এক অংশ থেকে অন্য অংশে। তাতেই আমরা দেখি বিশাল বিজলির ঝলক, আর কখনো কখনো ধাঁধিয়ে যায় আমাদের চোখ।

তোমরা বলবে, আচ্ছা, না হয় বুঝলাম পানির কণা আর হাওয়ার কণায় ঘষা লেগে বিজলি তৈরি হয় আর তাতে আলোর ঝলক দেখা যায়। কিন্তু বাজ পড়ার কড়কড় আওয়াজও সেকি এই বিজলি থেকেই আসে?

হ্যাঁ, তাই। হাওয়ার ভেতর দিয়ে যখন বিজলির ঝলক নামতে থাকে এক মেঘ থেকে আরেক মেঘে, কিংবা মেঘের কোল থেকে পৃথিবীর বুকে, তখন সেই পথের হাওয়াটা প্রচণ্ড রকম তেতে ওঠে। আর জানোই তো, গরম হাওয়া হালকা হলে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিজলি চমকাবার সময় তার চলতি পথের হাওয়া এমন নিমেষের মধ্যে তেতে উঠে ছড়িয়ে পড়ে যে, তাতে হাওয়ায় এক প্রবল তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এই তোলপাড়ই আমাদের কানে এসে বাজে কড় কড় আওয়াজ হয়ে। যেন তোপ দাগা হয়েছে এমনি গুড়-গুড়, গুম-গুম আওয়াজ হতে থাকে মেঘে মেঘে।

শুনে কি খুব অবাক হলে? এতদিন হয়তো ভেবেছিলে আকাশে মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি লাগে, আর তাতেই সৃষ্ট হয় অমন কড় কড় আওয়াজ। এবার ভাবছ, তা কি তবে সত্যি নয়?

মেঘ যদি পাথরের মতো শক্ত জিনিস হত তাহলে ঠোকাঠুকি লেগে শব্দ হত নিশ্চয়ই। কিন্তু উড়োজাহাজে চেপে যদি আকাশে মেঘের ওপর ওঠ তাহলে দেখবে মেঘ রীতিমতো হালকা জিনিস। দুটো মেঘে ঠোকাঠুকি লাগলে একটা আরেকটার মধ্যে বেমালুম ঢুকে যাবে। তাতে টক্কর লেগে শব্দ হবার বা আগুনের ফুলকি দেখা দেবার কোন কথাই নয়।

আগেকার দিনের লোকদের মনে আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ সম্বন্ধে আরো নানা আজগুবি ধারণা ছিল। কেউ ভাবত ওগুলো শয়তানের কাণ্ডকারখানা। কেউ ভাবত এসব নানা রকম দেবতাদের কীর্তি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক অনেক পরীক্ষা করে পুরনো দিনের লোকদের এসব ধারণা আজ পালটে দিয়েছেন।

আকাশের বাজ পড়া যে বিদ্যুৎ থেকে হয় একথা মানুষ আবিষ্কার করেছে আজ থেকে প্রায় আড়াই শো বছর আগে।

মার্কিন দেশের এক নামজাদা বিজ্ঞানী—নাম তাঁর বেনজামিন ফ্র্যাংক্লিন, তিনিই প্রমাণ করেন যে, আকাশের বজ্র আসলে বিজলির ঝলক ছাড়া আর কিছু নয়।

১৭৫২ সালে এক ঝড়ো দিনে ফ্র্যাংক্লিন আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর এক অদ্ভুত ঘুড়ি। এই ঘুড়ির ওপর লাগানো ছিল ছোট একটা ধাতুর দণ্ড। আর ঘুড়ির রেশমি সুতোর নিচের মাথায় বেঁধেছিলেন একটা সাধারণ দরজার চাবি। চাবিটার সাথে একটা রেশমি ফিতে বেঁধে তিনি তা হাতে ধরে রেখেছিলেন। এক সময় দেখলেন ফিতের কিনারার সুতোগুলো বিদ্যুতের আবেশে খাড়া হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন ভয় পেলে মানুষের গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। চাবির কাছে হাত নিয়ে যেতেই চাবি থেকে হাতের মধ্যে একটা বিদ্যুতের ঝলক বয়ে গেল। ভাগ্যিস্ ফ্র্যাক্লিন সেদিন নেহাত প্রাণে মারা পড়েন নি!

আগেই বলেছি, মেঘে বিজলি চমকাবার সময় তৈরি হয় আলো আর শব্দ। এ দুটোই সৃষ্টি হয় প্রায় একই সাথে। কিন্তু আলো চলে চোখের পলকে—এক সেকেণ্ডে মোটামুটি তিন লক্ষ কিলোমিটার। অথচ হাওয়ার ভেতর দিয়ে শব্দের গতি এর প্রায় দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ—তিন সেকেণ্ডে

মাত্র এক কিলোমিটার। বড় মেঘ যদি আমাদের কাছ থেকে দু'কিলোমিটার দূরে থাকে তাহলে সেখান থেকে বিজলি চমকাবার শব্দ আসতে যেটুকু সময় লাগবে সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; কিন্তু শব্দ এতটা পথ আসতে সময় যাবে প্রায় ছ'সেকেণ্ড। এ জন্যেই বিজলি চমকের আলো দেখা যাবার বেশ খানিক পরে তার কড় কড় শব্দটা শোনা যায়।

বজ্রপাতের ফলে মানুষ মারা যেতে পারে। বাড়ি-ঘর, কল-কারখানারও নানা রকম ক্ষতি হয়। মানুষ ভাবতে লাগল, এসব ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার কি কোন উপায় নেই? বহু দিনের চেষ্টায় সে সব উপায়ও মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন উঁচু জায়গায়—বিশেষ করে সে জায়গাটা যদি সুচলো হয় তাহলে—বেশি বাজ পড়ে, অর্থাৎ সেখানে আকাশের বিদ্যুৎ বেশি আকৃষ্ট হয়। এই থেকে বাজ ধরার জন্যে এক রকম ফাঁদ তৈরির উপায় জানা গেল। বাড়ির ছাদে বেশ উঁচু করে সুচালো তার বসানো হয়, তারপর সেই তারের অন্য প্রান্ত বাড়ির বাইরে নিয়ে পুঁতে দেয়া হয় মাটিতে। এই তারের সুচালো মাথা মেঘের বিজলিকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে সরাসরি মাটিতে পৌঁছে দেয়। তার ফলে বাড়ির গায়ে বাজ পড়ে বাড়ির কোন ক্ষতি করতে পারে না।

বাজ সচরাচর উঁচু জায়গায় পড়ে বলে ঝড়বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে ছাতা মুড়ি দিয়ে চলা বা উঁচু গাছের নিচে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়।

খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে মাটিতে শুয়ে পড়লে বজ্রপাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

বজ্রপাতে শুধু যে মানুষের ক্ষতি হয় তা নয়, যথেষ্ট উপকারও হয়। হাওয়ায় রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন গ্যাস। আসলে হাওয়ার পাঁচ ভাগের চার ভাগই নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন গাছপালার জন্যে একান্ত দরকারী। কিন্তু হলে কি হবে, গাছপালা হাওয়া থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন টেনে নিতে পারে না। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের প্রচণ্ড শক্তিতে বাতাসের নাইট্রোজেন অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেন সার তৈরি করে। এই সার বৃষ্টির পানির সাথে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, আর তাতে জমির উর্বরা শক্তি

বাড়ায়। প্রতি বছর এইভাবে হাজার হাজার টন নাইট্রোজেন সার তৈরি হয়ে থাকে।

তাহলে দেখলে তো আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ কেবল একতরফা ক্ষতিই করে না, এ থেকে আমাদের যথেষ্ট উপকারও হয়। বরং আকাশে বিজলি না চমকালেই আমাদের চাষবাসের বেজায় ক্ষতি হতো।

বাংলাইন্টারনেট.কম

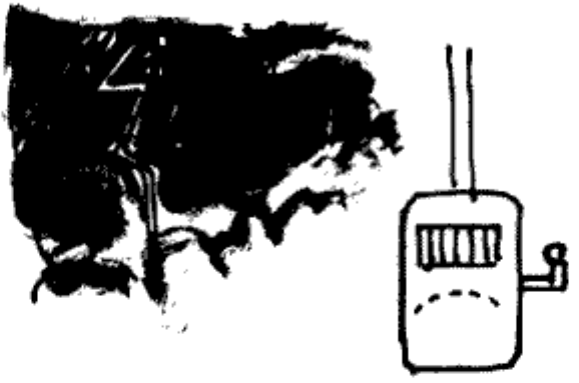

বিজলি থেকে সাবধান

এককালে মানুষ শুধু আকাশে দেখত চোখ-ধাঁধানো বিজলির ঝলক। আজ বিজলি এসেছে আমাদের ঘরে ঘরে। বিজলির সেই বিষম শক্তিশালী দৈত্যটাকে মানুষ বন্দী করে ফেলেছে, আর তাকে দিয়ে কত যে কাজ করিয়ে নিচ্ছে!

আজকের যুগটাকেই কখনো কখনো বলা হয় বিজলির যুগ! তার কারণ আজকাল বেশির ভাগ কল-কারখানাই চলে বিজলির শক্তিতে। কয়লা বা তেল থেকে রাসায়নিক শক্তি পাওয়া যায় তাপের আকারে। এই শক্তিকে পাওয়ার হাউজে পরিণত করা হয় বিজলির শক্তিতে। তারপর তাকে তারের ভেতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দূর-দূরান্তে শহর-বন্দরে, কল-কারখানায়।

শুধু কল-কারখানার কথাই বা বলি কেন? ঘর-বাড়িতেও রোজকার জীবনে বিজলির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। ঘরে ঘরে বিজলির আলো,

পাখা, রেডিও, টেলিফোন, ইস্ত্রি, টেলিভিশন, হিমায়ক যন্ত্র, বিজলির চুলো—এমনি আরো নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। শুধু শহরের এলাকাতেই নয়, গ্রামে গ্রামেও বিজলির তার যেতে শুরু করেছে। সারা দেশময় ঘরে ঘরে বিজলির ব্যবহার ক্রমেই আরো বাড়বে এটা একরকম হলফ করে বলা যায়।

আমাদের জীবনের আরো দশ-পাঁচটা আধুনিক জিনিসের মতো বিজলির ব্যবহারে যেমন নানারকম সুবিধা আর আরাম-আয়েশ পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি সমস্যাও কিছু কম দেখা দিচ্ছে না। হয়তো আম্মা বললেন, 'খোকা, এখন ভাল গান আছে, রেডিওটা একটু চালাও দেখি।" তুমি সুইচটা টিপতে গিয়ে, অমনি শরীরে একটা বিষম ঝাঁকুনি খেলে। অর্থাৎ তোমার 'শক' লেগেছে, হয়তো সুইচটা খারাপ, সেখানে বিদ্যুৎ 'লীক' করছে।

কিংবা হয়তো তোমরা ভাইবোনে মিলে এক সাথে ছোটদের অনুষ্ঠান 'কলকাকলী' শুনছ। হঠাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে গেল, ঘরের পাখাও থেমে গেল। হয়তো বাড়ির 'ফিউজ' জ্বলে গিয়েছে ! ফিউজ' মানে হল একটা বিশেষ ধরনের ছোট সরু তার, যার ভেতর দিয়ে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি বিজলি চলাচল করলে সেটা অতিরিক্ত গরম হয়ে গলে যায়। এবার এই 'ফিউজের' তার না বদলানো পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে বাতি জ্বলবে না, পাখা ঘুরবে না, রেডিও বাজবে না। 'ফিউজ' বদলাবার সময় সাবধান—যেন 'শক' না লাগে।

কোন সুইচ বা তার থেকে বিদ্যুৎ "লীক' করছে কিনা, অর্থাৎ আপনা—আপনি বিজলি চুঁয়ে পড়ছে কিনা সেটা বোঝা যায় একটা 'টেস্টার' যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্রটার দাম খুব কম—দেখতে অনেকটা কলম আর স্ক্রু-ড্রাইভারের মাঝামাঝি। ওপরের দিকটায় কলমের মতো ক্লিপ লাগানো—যাতে পকেটে আটকে রাখা যায়। নিচের দিকে আছে স্ক্রু-ড্রাইভারের মতো একটা পাতলা ধাতব জিব। এই পাতলা জিবটা কোন যন্ত্র, সুইচ বা প্লাগের ধাতব অংশের গায়ে লাগিয়ে টেস্টারের পেছনে আঙুল ছোঁয়াতে হয়। যদি এর ভেতরে আলো জ্বলে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে জায়গায় টেস্টারটা ছোঁয়ানো হয়েছে সেখান দিয়ে বিজলি চলাচল করছে, অর্থাৎ এখানে হাত বা পাঠে করলে বিপদ ঘটবে। সাথে সাথে শুকনো মোটা কাপড় বা শুকনো পুরু কাগজ দিয়ে

জড়িয়ে ধরে সুইচটা 'অফ' করে দিতে হবে।

অনেক সময় বর্ষার দিনে বাড়ির ভেজা দেয়ালে হাত দিলেও 'শক' লাগতে পারে। তখন বুঝতে হবে বিজলির কোন তারের আবরণ দেয়ালের ভেতরে বা বাইরে—ছিঁড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী ডেকে এনে তার সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে; বেশি পুরনো হলে তারগুলো বদলে ফেলারও দরকার হতে পারে।

বিজলি বাতি নিভে গেলে 'ফিউজ' বদলানো এমন শক্ত কিছু নয়। কিন্তু মনে রাখবে এজন্যে ফিউজের বিশেষ ধরনের তারই শুধু ব্যবহার করতে হবে। এর চেয়ে সরু তার লাগালে সেটা সাথে সাথে আবার জ্বলে যাবে। বেশি মোটা তার লাগালে ফিউজ জ্বলবে না, কিন্তু আর কোথাও কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা বিজলির তার জ্বলে যেতে পারে। এমন কি তাতে বাড়িতে আগুনও ধরে যেতে পারে। এছাড়া ফিউজ বদলাবার সময় সবার আগে বাড়ির 'মেন সুইচ' 'অফ' করে নিতে হবে। তা নইলে হঠাৎ 'শক' লাগার ভয় থাকবে।

শুধু ফিউজ বদালানো নয়, যে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ভেতরটা পরীক্ষা করার দরকার হলে সেটার সুইচ অফ করে প্লাগ আগে খুলে নেওয়া দরকার, যাতে সেই যন্ত্রের ভেতর বিজলি চলাচল না থাকে। নিতান্ত যদি চালু অবস্থায় কোন যন্ত্র পরীক্ষা করতে হয় তাহলে শুকনো একটা কাঠের টুলের ওপর বসে বা রবারের তলাওয়ালা জুতা পরে অথবা হাতে রবারের দস্তানা পরে তবে তা করা উচিত। তাহলে আর শরীরের ভেতর বিজলি চলাচলের ভয় থাকবে না। বিজলির প্লাগ লাগাবার সময় বা জ্বলে যাওয়া বাতির বাল্‌ব বদলে নতুন বাল্‌ব লাগাবার সময়ও সুইচ 'অফ' করা উচিত।

শুকনো কাঠের ভেতর বিজলি চলাচল করে না, কিন্তু ভেজা কাঠে করে। শুকনো হাতের চাইতে ভেজা হাতের ভেতর বিজলি অনেক ভালভাবে চলাচল করতে পারে।

এ জন্যে কোন ভেজা জায়গায় দাঁড়িয়ে বা ভেজা হাতে বিজলির সুইচ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দেওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। আগে হাত শুকিয়ে অথবা শুকনো মোটা কাপড় হাতে নিয়ে তার সাহায্যে সুইচ 'অন' বা

'অফ' করা উচিত। এই একই কারণে বাথরুমে বা গোসলখানায় রেডিও বা এ ধরনের আর কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া মানেই বিপদ ডেকে আনা; অবশ্য অল্পশক্তির ব্যাটারিতে যে সব যন্ত্র চলে, যেমন টর্চ বা ট্রানজিস্টার রেডিও, সে সবের বেলা একথা খাটে না।

অনেক সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির 'কর্ড, বা নমনীয় তারের ওপরকার রবার বা প্লাস্টিকের আবরণ ক্ষয়ে যায়। এ ধরনের ক্ষয়ে যাওয়া তার সাথে সাথে বদলে ফেলা দরকার—তা নইলে ভেতরের বিদ্যুৎবাহী তারের সাথে ছোঁয়ায় মারাত্মক শক লাগতে পারে। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির বেলায় এ ধরনের সাবধানতা বেশি দরকার।

কখনো কখনো ইস্ত্রি বা এ জাতীয় যন্ত্রের প্লাগ হাত থেকে ফস্‌কে মেঝেয় পড়লে ফেটে যায় বা ভেঙ্গে যায়। তাহলে তাও সাথে সাথে বদলে ফেলতে হবে। তা নইলে এই ভাঙ্গা প্লাগ লাগাতে গিয়েও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে কখনো হাত দিতে দেয়া উচিত নয়। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, টোস্টার, হীটার এসব যন্ত্রে শুধু যে শক লাগার ভয় তাই নয়, আঙ্গুলে তাত লেগে হাত পুড়ে যাবার ভয়ও থাকে।

কারো যদি নিতান্তই শক লাগে বা 'জীয়ন্ত'(বিদ্যুৎ চলাচল করছে এরকম) তারে হাত আটকে যায় তাহলে কাছাকাছি সুইচ থাকলে সেটা আগে অফ করে দিতে হবে। তার থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে তাকে শুকনো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হবে, তা নইলে যে ধরছে তার গায়েও বিজলির শক লাগতে পারে।

এসব থেকে বুঝি ভাবছ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মাত্রেই দেখা যাচ্ছে মারাত্মক বিপদ লুকিয়ে আছে। আসলে সাবধানে ব্যবহার না করলে ছুরি, ব্লেড, কুড়াল বা ঢেঁকি এসব অতি সাধারণ যন্ত্রপাতিও ভয়ঙ্কর পিদ ঘটাতে পারে। এই বিজলির যুগে বাস করতে হলে বিজলি ব্যবহারে সাবধানতার নিয়ম-কানুনগুলো আমাদের সবাইকে জানতে হবে বৈ কি!

বাংলাইন্টারনেট.কম

বেড়িয়ে আসি চাঁদের দেশে

চাঁদ মামা মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই কবে থেকে। মানুষ দূর থেকে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। মামার বাড়ির কথা নিয়ে কত ছড়া কেটেছে, কবিতা লিখেছে—কিন্তু মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু বহু হাজার বছর ধরে দেরি করে করে, মানুষ শেষটায় মামাবাড়ি যাবার কায়দাটা বের করে ফেলেছে। ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই তারিখে প্রথম দু'জন প্রথম মানুষ— আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন তাঁদের নাম—গিয়ে নেমেছেন চাঁদের বুকে। তারপর আবার সেই বছরই ১৯শে নভেম্বর চাঁদে গিয়ে নেমেছেন আরো দু'জন—চার্লস কনরাড আর অ্যালান বীন।

প্রথম প্রথম মামা বাড়ি যাওয়া তো তাই গিয়ে বেশিক্ষণ থাকেননি তাঁরা। দিনকার দিনই সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু এরপর যারা যাবে তাদের কি চাঁদমামা অত সহজে ছাড়বে? হয়তো দু'চার দিন থাকতে হবে

বাংলাইন্টারনেট.কম

সেখানে। পরে চাই কি—দু'চার মাস কিংবা দু'চার বছরও থাকতে হতে পারে।

চাঁদের ফটো তুলে, চাঁদে নভোযান পাঠিয়ে সেখানে মানুষ নেমে এবং আরো নানাভাবে মানুষ চাঁদ সম্বন্ধে যতটা জেনেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে চাঁদ মামার দেশ আমাদের এই চেনা-জানা পৃথিবী থেকে একেবারেই অন্য রকমের। পৃথিবীর ওপর আমরা ডুবে আছি হাওয়ার সমুদ্রে। এই হাওয়া থেকে আমরা পাই অতি দরকারী শ্বাস-প্রশ্বাসের অকসিজেন। তাছাড়া আমাদের শরীরও চাপের তলায় থাকতে অভ্যস্ত। চাঁদের দেশে হাওয়া নেই বললেই চলে। হাওয়া না থাকলে সেখানে শ্বাস নেবার অকসিজেন ছাড়া মানুষ দু'চার মিনিটের বেশি বাঁচতে পারে না। কাজেই চাঁদে যেতে হলে সাথে করে অকসিজেন বয়ে বেড়াতে হবে সারাক্ষণ! তাছাড়া এমন পোশাক পরে থাকতে হবে যাতে শরীরের চারদিকে পৃথিবীর মতো হাওয়ার চাপ বজায় থাকে।

চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। তাই পৃথিবীর তুলনায় তার আকর্ষণের টানও অনেক কম। এর ফলে পৃথিবীর ওপর তোমার ওজন যদি হয় ত্রিশ কিলোগ্রাম তাহলে চাঁদের ওপর হবে মোটে পাঁচ কিলোগ্রাম অর্থাৎ পাঁচ সেরের মতো। এত হালকা শরীর নিয়ে চলাফেরা করা কিন্তু কঠিন। আস্তে একটু লাফ দিলেও শাঁ করে উড়ে চলে যাবে বহু দূরে। আবার পড়ে গেলে ব্যথাটা পাবে পৃথিবীর ওপরকার মতোই। কাজেই হাঁটতে গেলে সাবধান! মামাবাড়ি গিয়ে ফুর্তির চোটে বেশি করে লাফ মারলে খামখা হাত-পা ভাঙ্গবে।

চাঁদে হাওয়া নেই, পানিও নেই! তাছাড়া আমাদের পৃথিবীতে মোটামুটি বারো ঘণ্টা দিন, বারো ঘণ্টা রাত। চাঁদের ওপর একেকটা দিন হল পৃথিবীর দু'হপ্তার সমান, রাতও তাই। আর দিনের বেলা সূর্যের এমন কড়া তাপ যে সেখানে পানি রেখে দিলে দেখতে দেখতে টগবগ করে ফুটে বাষ্প হয়ে যাবে। আবার রাতের বেলা এমন ঠাণ্ডা যে, পৃথিবীর কোথাও এত বেশি ঠাণ্ডা নেই—এমন কি দক্ষিণ মেরুতেও না।

বাংলাইন্টারনেট.কম

-এই প্রচণ্ড গরম আর ঠাণ্ডার হাত থেকে গা বাঁচাতে হলে মানুষকে গিয়ে ঢুকতে হবে চাঁদের মাটির তলায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের দেশে মাটির তলায় ঠাণ্ডা গরম দুই-ই কম। কাজেই সেখানে ঘর বানিয়ে নিতে পারলে হয়তো কিছুটা আরামে থাকা যাবে। এমন কি মাটির তলায় পাথরের বুক থেকে হয়তো সামান্য 'পানিও যোগাড় করা যেতে পারে।

কিন্তু মামাবাড়ি গেলে তো সব খাবার-দাবার পৃথিবী থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না! সাথে করে যদি খাবারই নিয়ে যেতে হল তাহলে আর মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে লাভটা কি! কাজেই ক্রমে ক্রমে ওখানে মাটির তলায় ঘর বানিয়ে সেখানে বিশেষ চাষ-বাসের আয়োজন করতে হবে। এক ধরনের শেওলার চাষ নাকি চাঁদে সহজেই করা যাবে, আর তা থেকে নানা রকম খাবারও তৈরি করা যাবে।

চাই কি, আজ থেকে বিশ-তিরিশ বছর পরে হয়তো স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পিকনিক করতে যাবে চাঁদে। তারপর সেখান থেকে শেওলার চপ-কাটলেট, কেক আর সন্দেশ খেয়ে হপ্তাখানেক বেড়িয়ে আসা নেহাত মন্দ হবে না, কি বল তোমরা?

বাংলাইন্টারনেট.কম

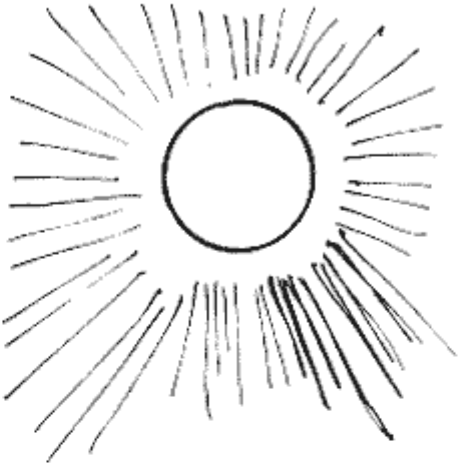

হে সূর্য, তুমি আমাদের ...

হে সূর্য,
তুমি আমাদের আলো আর উত্তাপ দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ওই উলঙ্গ ছেলেটাকে।

এক কিশোর কবি লিখেছিল কথাগুলো। শীতের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া আর স্যাঁতসেঁতে ঘরের কথা মনে হয়েছিল তার। আর মনে হয়েছিল রাস্তার এক উলঙ্গ ছেলের কথা। তাই সে প্রার্থনা জানিয়েছিল সূর্যের কাছে। সূর্য ছাড়া কে আর দূর করতে পারে আমাদের আলোর অভাব, তাপের অভাব?

এই পর্যন্ত লিখে লেখাটা পড়ে শুনিয়েছিলাম রীমাকে। রীমা এখনও নিজে নিজে পড়তে পারে না, কিন্তু ছড়া মেটাতে পারে। ভেবেছিলাম কথাগুলো শুনে সে খুশি হবে। কিন্তু উলটো সে আমাকে গড়গড় করে প্রশ্ন

বাংলাইন্টারনেট.কম

করে বসলঃ কেন? কেন? বিজলির বাতি? মোমবাতি? হ্যারিকেন? চুলোর আগুন?

বহুকাল আগে একবার আমাদের গ্রামের এক কচির শেখকে সূর্যের কথা বোঝাতে গিয়ে পড়েছিলাম বিপদে। আবার দেখছি তেমনি এক মুশকিলেই পড়া গেল। রীমা-কে আমি সব কথা বোঝাতে পারব না। তবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে।

বিজলির আলো আসলে পাই আমরা কয়লা পুড়িয়ে সেই তাপে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে তার সাহায্যে। কয়লা এসেছে বহু কোটি বছর আগেকার বিশাল গাছপালার বন মাটিতে চাপা পড়ে। সূর্যের আলো আর তাপ না পেলে এসব গাছপালা জন্মাতে পারত না। কাজেই কয়লাও হত না।

কখনো বিজলি তৈরি হয় নদীর পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু নদীতে স্রোত হয় উঁচু জায়গা থেকে পানি নিচে নামে বলে। পানিকে কে নেয় এমনি উঁচুতে? সমুদ্র খাল-বাষ্প হয়ে মেঘ হয়ে বিলের পানি সূর্যের তাপে গিয়ে পড়ে উঁচু পাহাড়-পর্বতে। সেখান থেকেই বয় নদী।

চুলোর আগুন হয় কাঠ না কয়লা জ্বালিয়ে। দুই-ই আসে সেই গাছপালা থেকে। হয় সে আজকালের গাছপালা, নয়তো সেই বহু পুরনো কালের গাছপালা। আবার সেই গাছপালার জন্যে দরকার সূর্যের আলো আর তাপের।

কেরোসিন আর পেট্রলের সৃষ্টি হয়েছে খুব সম্ভব বহু কোটি বছর আগেকার পৃথিবীতে প্রচুর চর্বিদার সব জীবজন্তু মাটির তলায় চাপা পড়ে। নানা ধরনের উদ্ভিদ ছিল এসব জীবজন্তুর খাবার। কাজেই এরাও বেঁচেছে, বড় হয়েছে, বংশ বাড়িয়েছে সূর্যের বদৌলতে। যেমন কেরোসিন আর পেট্রোল, তেমনি গ্যাস। তারও গোড়ায় সেই জীবজন্তু আর গাছপালা।

তাহলে দেখ, সূর্য শুধু যে আলো আর তাপ দেয় তাই নয়। আজকে আমরা যত রকম যন্ত্রপাতি চালাই তার সবটারই শক্তি আসছে কোন-না

-কোনভাবে সূর্য থেকেই। যদি না থাকত সূর্য তাহলে খুব সম্ভব থাকত না পৃথিবীটাই। যদি বা হত পৃথিবী, তাহলে সে হত একটা ঠাণ্ডা মরা পাথরের পিণ্ড। পৃথিবীতে জীবন এসেছে সূর্যের আলো আর তাপের বদৌলতে। মানুষ যে তার সভ্যতার সৌধ গড়ে তুলেছে সেও পৃথিবীতে সূর্যের তেজ নানাভাবে জমানো ছিল বলেই।

অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তিলে তিলে শক্তির ভাণ্ডার জমা হয়েছে। সেগুলোই আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাচ্ছি। চলছে কলকারখানা, ঘর-ঘর শোঁ শোঁ করে চলছে মোটরগাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ; উড়ছে রকেট, ঘরে ঘরে জ্বলছে বিজলি বাতি, লণ্ঠন বা কুপি।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসবই হল পৃথিবীর বুকে জমানো তেজ। এই জমানো তেজ কি অফুরন্ত? এর কি শেষ নেই? চিরকাল কি মানুষ আজকের মতোই পেতে থাকবে কেরোসিন, কয়লা, পেট্রোল? এসব কথা এতদিন ওঠে নি। কেননা এসবের ব্যবহার হত কম। পৃথিবীতে এসব জ্বালানির পরিমাণ ঠিক কত ছিল তা কেউ ভাল করে জানতও না। নতুন নতুন খনির খবর অনবরতই বেরোত।

কিন্তু আজ আমরা জানি। সারা দুনিয়ায় মানুষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। দুনিয়াজোড়া জরিপ থেকে জানা গিয়েছে কোন্ দেশে কোন্ কোন্ খনিজ কতখানি আছে। কিংবা আরো নতুন খনির খোঁজ পেলেও কতটা পরিমাণ পাওয়া সম্ভব। উন্নত দেশগুলোয় যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, শক্তির ব্যবহার বিপুল পরিমাণ বেড়েছে।

এখন বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর খনিজ সম্পদ অফুরন্ত নয়। পৃথিবীতে জমানো শক্তির ব্যবহার আজ যে হারে চলেছে এভাবে চলতে থাকলে একদিন না একদিন তা শেষ হবে। আর এই শেষ হবার দিন আসতে খুব বেশি বাকিও নেই।

কী সে হিসেব? কত দিনে শেষ হবে পৃথিবীর সব শক্তির উৎস? সব কিছু এক সাথেই শেষ হবে এমন নয়। কোনটা শেষ হবে তাড়াতাড়ি। কোনটা চলবে আরো বেশ কিছু দিন।

যেমন ধর, দুনিয়ার জ্বালানি গ্যাসের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে আজ থেকে তিরাশি কি চল্লিশ বছরের মধ্যে। তেলও শেষ হবে শ'খানেক বছরের মধ্যেই। শুধু কয়লা ফুরোতে লাগবে আরো চারশো কি পাঁচশো বছর। তবে কয়লার ব্যবহার যে হারে বাড়ছে তাতে দু'শো বছরের মধ্যে দুনিয়ার সব কয়লা শেষ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

বাংলাইন্টারনেট.কম

এসব ছাড়া আরেক নতুন ধরনের শক্তির কথা আগে বলা হয় নি। সে হল

পরমাণুশক্তি। আজকাল পরমাণুশক্তি পাবার যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সে হল বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির উন্নতি না ঘটলে দুনিয়ার ইউরেনিয়াম শেষ হতে খুব বেশি দিন লাগবে না। তবে উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে। সেটা সফল হলে পরমাণু-শক্তির জ্বালানি অত সহজে শেষ হবে না। এমন কি হয়তো সমুদ্রের পানি থেকেই পরমাণুশক্তির জন্যে প্রায় অফুরন্ত উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শক্তি সংগ্রহের যে সব উপায় মানুষের এ পর্যন্ত জানা আছে তাতে দুনিয়ার সব জ্বালানি শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই।

তারপর কি হবে?

ঘরে ঘরে বিজলি বাতি কি নিভে যাবে? থেমে যাবে রাস্তায় মোটর, ট্রাক, বাসের ঘর ঘর আওয়াজ, প্লেনের গর্জন, কল-কারখানার গুঞ্জন? তাহলে যে শুধু পৃথিবীতে সভ্যতার স্পন্দন থেমে যাবে তাই নয়, যে হারে দুনিয়ার মানুষ বাড়ছে তাতে তাদের জন্যে খাবার যোগানো, শীতের দেশের মানুষদের বেঁচে থাকার মতো তাপ যোগানোই হয়ে দাঁড়াবে অসম্ভব। এখনই সাবধান না হলে, হিসেব করে পৃথিবীর জমানো সম্পদ খরচ না করলে একদিন এ রকম ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়।

সত্তরের দশকে দুনিয়াজোড়া হু হু করে বেড়েছে তেলের দাম। বাড়ছে কয়লার দাম, কাঠের দাম। এর পর আরো বাড়বে। কাজেই এখনই শক্তির অন্যান্য উৎসের খোঁজ না করলে সামনে বিষম বিপদ।

একদল বিজ্ঞানী বলছেন, আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস তো হল সূর্য। প্রতিদিন সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি এসে পড়ছে পৃথিবীর ওপর। এই বিপুল তেজের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র আটকা পড়ে সারা দুনিয়ার সব গাছপালার সবুজ পাতায় সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। তা থেকেই পাওয়া যায় দুনিয়ার সব উদ্ভিদ আর প্রাণীর জীবন ধারণের শক্তি।

সারা বছরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি মানুষ ব্যবহার করে সূর্য থেকে ততটা শক্তি এসে পৃথিবীতে পড়ে মাত্র দশ মিনিটে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

এই যে বিপুল পরিমাণ শক্তি দিনরাত আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের ওপর তার অতি সামান্য ভগ্নাংশই আমরা ব্যবহারের চেষ্টা করছি।

একেবারেই করছি না তা নয়। মাছের শুট্‌কি করতে, ফলমূল শুকিয়ে রাখতে, সমুদ্রের পানিকে শুকিয়ে লবণ তৈরির জন্যে সূর্যের তাপকে মানুষ কাজে লাগাচ্ছে সেই আদ্যিকাল থেকে। আজকাল কোন কোন দেশে পানি গরম করার জন্যে আর রান্নার জন্যে সূর্যচুল্লীর ব্যবহার বেশ চালু হয়েছে। বিশেষ করে যে সব দেশে বছরের বেশির ভাগ সময় সূর্যের আলো পাওয়া যায় সে সব দেশে সূর্যের শক্তিকে আরো বেশি করে কাজে লাগাবার দিকে বিজ্ঞানীদের নজর পড়েছে।

সূর্যের আলো থেকে অবশ্য যন্ত্রপাতি চালাবার মতো বা বিজলি তৈরির মতো খুব কড়া তাপ পাওয়া বেশ শক্ত। সেজন্যে বহু আয়না জোড়া দিয়ে বিরাট আকারের প্রতিফলক বানাতে হয়। এজন্যে খরচও পড়ে বেশি। ১৯৬৮ সালে ফরাসী দেশে পিরেনিজ পর্বতের গায়ে বহু আয়না বসিয়ে এমনি এক বিশাল সূর্যচুল্লী তৈরি হয়েছে। তাতে তাপ সৃষ্টি হয়েছে ৩৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বেশ ক'টি দেশে সূর্য থেকে নানা ধরনের যন্ত্র চালাবার ব্যাপারে পরীক্ষা চলছে।

মহাশূন্যে নভোযানে ব্যবহারের জন্যে সিলিকন ধাতু থেকে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের সৌর-কোষ। এর সাহায্যে সূর্যের তেজের ছ'ভাগের এক ভাগকে পরিণত করা যাচ্ছে বিদ্যুতের শক্তিতে। এমনি সৌর-কোষ ক্যালকুলেটর এবং আরো নানা যন্ত্রে কাজে লাগানো শুরু হয়েছে।

তেল বা কয়লা থেকে তৈরি যন্ত্রে ধোঁয়া হয়, কালি হয়, বিষাক্ত গ্যাস বেরোয়। সূর্যচুল্লী থেকে এসব কিছুই হয় না। এ একটা মস্ত বড় সুবিধা। তাছাড়া তেল বা কয়লাকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বয়ে নেবার হাঙ্গামা আছে। বিজলি তৈরি হলেও তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেবার জন্যে তারের লাইন বসাতে হয়। সূর্যের আলো তো আছে প্রায় সবখানেই। যেখানে আলো সেখানেই সৌরচুল্লী বসিয়ে সেখানেই শক্তিটাকে ব্যবহার করা চলে।

এমনি পরীক্ষা চলছে হাওয়ার প্রবাহকে, সমুদ্রের পানির প্রবাহকে, জোয়ার-ভাটার শক্তিকে আরো বেশি করে মানুষের কাজে লাগানো যায় কিনা তা নিয়ে। কিন্তু এসব শক্তিও তো আদতে সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছনো শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

তাহলে আবার কি আমরা ফিরে যাচ্ছি পৃথিবীর আদি শক্তির উৎস সেই সূর্যের দিকেই? যে সূর্যের বিপুল শক্তি আরো বহু কোটি বছরেও শেষ হবে না!

সেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে কিশোর কবি সুকান্তের সাথে গলা মিলিয়ে আমরাও বলি ঃ হে সূর্য, তুমি আমাদের আলো আর উত্তাপ দিও... যেন উষ্ণ আর আলোকিত হয়ে ওঠে সেই উলঙ্গ ছেলেটার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর।

কথায় বলে ঃ "ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার"। কিন্তু ঢালও আছে, তলোয়ারও আছে—এর পর আর "হা রে রে রে" বলে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা কি?

জ্বী না, কিছুমাত্র বাধা নেই। শুরু করে দিলেই হল। হয়তো কয়েক শো মানুষ মারা পড়বে, কিংবা কয়েক হাজার; চাই কি কয়েক

বাংলাইন্টারনেট.কম

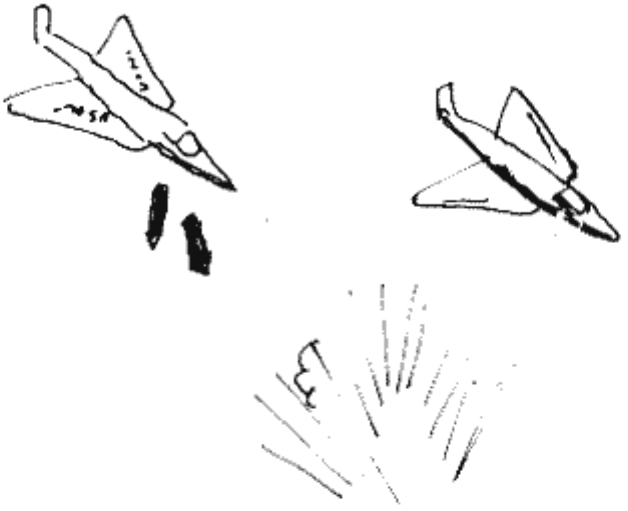

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

লাখ বা কয়েক কোটিও হতে পারে! ঢাল-তলোয়ার যোগান দেবার লোক রয়েছে। শুধু তাই না, তারা আবার দু'পক্ষেই যোগান দিতে রাজি। সেকালের রাজ-রাজড়ারা যেমন মোরগের লড়াই লাগিয়ে আমোদ পেতেন, আজকের রাজাধিরাজরা তেমনি হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে বিপুল আনন্দ পান।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। তারপর চল্লিশ বছরের মধ্যে দুনিয়াতে ছোট বড় মিলিয়ে অন্তত একশোটা যুদ্ধ বেধেছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ যুদ্ধ ঘটেছে দূরপ্রাচ্য আর দক্ষিণ এশিয়ায়; তারপর আসে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা আর ইউরোপ। কোন কোন মারাত্মক যুদ্ধ, যেমন ভিয়েতনামে, চলেছে বহু বছর ধরে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

সুখ-শান্তিতে মানুষে মানুষে মিলেমিশে থাকা যদি সভ্যতার লক্ষণ হয় তাহলে আমরা ক্রমে ক্রমে বেশি সভ্য হচ্ছি কিনা বলা মুশকিল। দিন দিন দুনিয়ায় যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে বরাদ্দ খরচা বাড়ছে বই কমছে না।

১৯১৩ সাল, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দুনিয়ায় প্রতি বছর যত ধন-সম্পদ সৃষ্টি হত তার শতকরা তিন বা সাড়ে তিন ভাগের বেশি সৈন্যসামন্তের জন্যে খরচ হত না। তখনকার তুলনায় আজ দুনিয়ায় প্রতি বছর ধন-সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে অনেক বেশি। আর প্রতি বছর তার প্রায় শতকরা সাত ভাগ খরচ হচ্ছে সৈন্যসামন্তের পেছনে। ১৯১৩ সালের তুলনায় যুদ্ধ বিগ্রহের জন্যে মানুষ আজ অন্তত ত্রিশগুণ বেশি খরচ করছে।

সারা দুনিয়ায় আজ শিক্ষার জন্যে যত খরচ হচ্ছে, যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে খরচ হচ্ছে তার চেয়ে প্রায় দু'গুণ বেশি। জনস্বাস্থ্যের জন্যে খরচার তুলনায় সৈন্য সামন্তের খরচা তিন গুণের চাইতেও বেশি। উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশের জন্যে বছরে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য দেয় তার চাইতে দুনিয়ায় সামরিক ব্যয় হয় অন্তত বিশ গুণ বেশি! এসব শুনলে কি আর মনে হবে যে, সারা দুনিয়ার বহু কোটি মানুষ আজ ডুবে রয়েছে অশিক্ষার অন্ধকারে! প্রতি বছর বহু লক্ষ মানুষ—শিশু-যুবা-বৃদ্ধ মারা পড়ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বিনাচিকিৎসায়! লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর প্রাণ দিচ্ছে অনাহারে, বহু কোটি মানুষ ভুগছে পুষ্টির অভাবে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৩ সালে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র দেড় ভাগ খরচা হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্রের পেছনে। ১৯৬৯ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা নয় ভাগে। অর্থাৎ সে দেশের লোক দিন-রাত খেটে যে ধনসম্পদ তৈরি করেছে তার এগার ভাগের এক ভাগই গেছে গোলাবারুদে। এসব গোলাবারুদের আবার বেশিরভাগই পড়েছে স্বাধীনতাকামী ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামের লোকদের ওপরে। আমেরিকার যুদ্ধের জন্যে এমনি খরচ আজও হচ্ছে।

মজার ব্যাপার হল, যে সব দেশ সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে নেই তাদেরও ঢাল-তলোয়ার তৈরির উৎসাহ কিছু কম নয়। ব্রিটেনের কথা ধরা যাক। ব্রিটেন গত ক'বছরে ভিয়েতনামের মতো লম্বা সময় ধরে কোন যুদ্ধে জড়ায়

বাংলাইন্টারনেট.কম

নি। কিন্তু সে দেশও অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে খরচ করছে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় সাত ভাগ।

এসব অস্ত্রশস্ত্র অনেকটাই যাচ্ছে দেশের বাইরে। ঢাল-তলোয়ার ছাড়া যেসব ছোট ছোট দেশ একে অন্যের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের জন্যে। জাতিসংঘের হিসেব থেকে দেখা যায়, দুনিয়ার বিভিন্ন ছোট দেশ শক্তিমান দেশগুলোর কাছ থেকে ১৯৫০ সালে অস্ত্র আমদানি করেছিল মাত্র ২২ কোটি মার্কিন ডলার দামের। ১৯৮০ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৮৩০ কোটি মার্কিন ডলার; অর্থাৎ ১৯৫০ সালের চেয়ে প্রায় নব্বই গুণ বেশি। তারপর থেকে এসব দেশের অস্ত্র আমদানির পরিমাণ আরো বেড়েছে।

ঢাল-তলোয়ারের কথা বলছি বলে ভেবো না যে, সত্যি সত্যি আজকের দিনের সৈন্যরা লোহার বর্ম পড়ে ঢাল-তলোয়ার-বল্লম-শড়কি নিয়ে যুদ্ধে নামছে। যুদ্ধের কায়দা-কৌশলের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে।

বিজ্ঞানের নানা আশ্চর্য আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে নানা নতুন ধরনের মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র বানাচ্ছে শক্তিশালী দেশগুলো।

সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের যে সব জিনিস সেগুলোর উন্নতির জন্যেও নানা ধরনের গবেষণা চালানো হচ্ছে অনবরতই। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস যদি বিক্রি হয় বছরে একশো টাকা দামের তাহলে তার উন্নতির জন্যে গবেষণায় ফ্রান্সে খরচ হয় দু'টাকার মতো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সাড়ে সাত টাকা। অন্যান্য বড় দেশে এর মাঝামাঝি গোছের। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র যদি একশো টাকার বিক্রি হয় তাহলে তার উন্নতির জন্যে গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেন আর ফ্রান্স প্রতিটি দেশই খরচ করে বছরে ত্রিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে।

ব্যাপারটা যে কী মারাত্মক তা বোঝা যাবে একটি হিসেব থেকে। সারা দুনিয়ায় আজ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি গবেষণায় যত টাকা খরচ হয় তার প্রায় অর্ধেক যায় সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উন্নতির জন্যে গবেষণায়। অথচ স্বাস্থ্য আর চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণায় মোট খরচ হয় অস্ত্রশস্ত্রের গবেষণার মাত্র ছ'ভাগের এক ভাগ!

বাংলাইন্টারনেট.কম

বোঝাই যাচ্ছে, দারুণ এক প্রতিযোগিতা চলছে ঃ কে কার চেয়ে ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারবে, কার তৈরি গোলাবারুদ বেশি বেশি বিক্রি হবে, গোলাবারুদের ব্যবসায় কে কত বেশি মুনাফা করবে। যার তৈরি হাতিয়ার যত ভাল অর্থাৎ তাতে যত বেশি মানুষ মারা পড়বে তার মুনাফা তত বেশি। জল্লাদরা জেল্লাদার পোশাক পরে তাদের অস্ত্র শানাচ্ছে যেন আমাদের চারিদিকে।

কত যে নতুন নতুন রকমের মারণাস্ত্র বেরিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আর সে সবেরই হল একই উদ্দেশ্য। কত বেশি মানুষকে কত কম খরচায় আর কত কম সময়ে খতম করে দেয়া যায় দুনিয়ার বুক থেকে। গোলা যদি মারতে হয় তো এমন গোলা যা দু'চার কিলোমিটার নয়, পাঁচ হাজার দশ হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে শত্রুর দেশে হানা দেয়। বোমা যদি ফেলতে হয় তো এমন বোমা যা দু'চার শো নয়, দু'চার দশ লাখ মানুষকে সাবাড় করে দিতে পারে।

দু'শো বছর আগে ইংরেজরা আমাদের কাবু করেছিল তার এক কারণ হল তারা গোলাবারুদের ব্যবহারে আমাদের চাইতে এগিয়ে গিয়েছিল। সেকালে বারুদই ছিল সব চাইতে জোরালো বিস্ফোরক। এরপর আজ থেকে শ'খানেক বছর আগে বেরোলো বারুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বিস্ফোরক টি,এন,টি। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় যে আণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল সেটার ধ্বংসক্ষমতা ছিল ২০,০০০ টন টি, এন, টি-র সমান। একটি বড়সড় শহর মিসমার হয়ে গিয়েছিল এই এক বোমার ঘায়ে। আমেরিকানরা হিসেব করে বলেছেন, এতে মানুষ মারা গিয়েছে ৭৯ হাজার ৪ শ'! তবে জাপানীদের হিসেবে অন্তত ২ লক্ষ ৫০ হাজার। এর মধ্যে যেসব হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়েছে তার এক একটার শক্তি আবার এ রকম কয়েক হাজার আণবিক বোমার সমান।

আণবিক বোমার ঘায়ে শুধু যে ঘরবাড়ি চুরমার হয়ে যায় তাই নয়, এর দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় মারণরশ্মিতে চারপাশের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাই ১৯৬৩ সালে দুনিয়ার ক'টি দেশের মধ্যে এক চুক্তি হয় যে, হাওয়ায়, মহাশূন্যে বা পানির তলায় আর আণবিক পরীক্ষা করা হবে না। কিন্তু

বাংলাবই.কম

চুক্তির সাথে সাথেই মাটির তলায় আণবিক বোমার পরীক্ষা গেল বেড়ে। ক্রমেই তৈরি হচ্ছে আরো শক্তিশালী, আরো নিপুণ, আরো কার্যকর আণবিক বোমা আর হাইড্রোজেন বোমা।

আরো সস্তায় আরো বেশি মানুষ মারার জন্যে এবার আয়োজন চলছে রাসায়নিক আর জীবাণু যুদ্ধের। বোমা মেরে মানুষ মারতে যা খরচ, এভাবে মারতে খরচ পড়বে তার চেয়ে অনেক কম। তবে মুশকিল হল যুদ্ধের সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র যেমন বেছে বেছে শুধু যুদ্ধরত সৈন্যদের ওপর প্রয়োগ করা যায়, বিষাক্ত গ্যাস বা জীবাণুর বেলায় তা হবার উপায় নেই। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে এরা দেশের সব নিরীহ মানুষের মধ্যেও মারণযজ্ঞ বাধাবে।

বিষাক্ত গ্যাস যুদ্ধে প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯১৪ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধের চার বছরে প্রায় সোয়া লক্ষ টন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তাতে আক্রান্ত হয় প্রায় তের লাখ লোক, তার মধ্যে মারা পড়ে প্রায় এক লাখ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের তুলনায় আজ এসব বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য অনেক উন্নত হয়েছে। অর্থাৎ সেদিনের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক বিষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া সে বিষ শত্রুর এলাকায় পৌঁছে দেবার কায়দারও আজ অনেক উন্নতি ঘটেছে। মাত্র চার টন ওজনের ভি-এক্স (VX) নামের গ্যাসীয় স্নায়ুবিষ যদি কোন বড় শহরের ওপরে ছড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে অন্তত এক লাখ লোক প্রায় সাথে সাথেই মারা পড়বে। এই গ্যাস এত মারাত্মক যে, এক গ্রামের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণও বাতাসের সঙ্গে কারো নাকে গেলে তার মৃত্যু ঘটবে। নাকে না গেলেও এক গ্রামের দুশো ভাগের এক ভাগ যদি গায়ের চামড়ায় লাগে তাহলেও মৃত্যু অবধারিত।

এর চেয়েও চমকপ্রদ ফল পাওয়া যেতে পারে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে। ধরা যাক, একটি বড় শহরের ওপর উড়োজাহাজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোগ্রাম পরিমাণ বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু গুঁড়ো আকারে ছড়িয়ে দেয়া হল। তাতে প্রায় লাখ খানেক লোক প্লেগে মারা পড়বে। ভয়ে শহর থেকে পালিয়ে রোগাক্রান্ত লোকেরা প্লেগ ছড়িয়ে দেবে অন্যান্য লোকালয়েও।

এমনি জীবাণু শুধু মানুষের বিরুদ্ধে নয়, গৃহপালিত পশু, এমনকি

বাংলাইন্টারনেট.কম

গাছপালার বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়। তাতে গৃহপালিত পশু আর শস্য ধ্বংস হয়ে শত্রুর চরম খাদ্যসংকট দেখা দেবে। অনাহারে শত্রু পক্ষ আপনা আপনি কাবু হয়ে পড়বে।

এসব কিন্তু একেবারেই কাল্পনিক ভবিষ্যতের কথা নয়। ১৯২৫ সালে জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক চুক্তি হয় জীবাণু ও রাসায়নিক যুদ্ধকে বেআইনী ঘোষণা করে। কিন্তু তবু আজ দুনিয়ার হাজার হাজার বিজ্ঞানী জীবাণু আর রাসায়নিক যুদ্ধের বিভিন্ন উপায় নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোরিয়ার যুদ্ধে আর ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন পক্ষ জীবাণু ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেছে এ-রকম অভিযোগ উঠেছে।

যুদ্ধই যাদের ব্যবসা, যুদ্ধ থেকে যাদের কোটি কোটি টাকার মুনাফা, মানুষ মারার নতুন নতুন কৌশলই তাদের দিন-রাতের চিন্তা।

কিন্তু দুনিয়ার কোটি কোটি মেহনতি মানুষ তো যুদ্ধ চায় না। তারা তাদের মেহনত দিয়ে শান্তিময়, প্রাচুর্যময়, সুখী পৃথিবী গড়তে চায়। এমনি সব শান্তিকামী মানুষরা একজোট হলে যুদ্ধবাজদের নোংরা নৃশংস যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কি বন্ধ করা যায় না?

বাংলাইন্টারনেট.কম

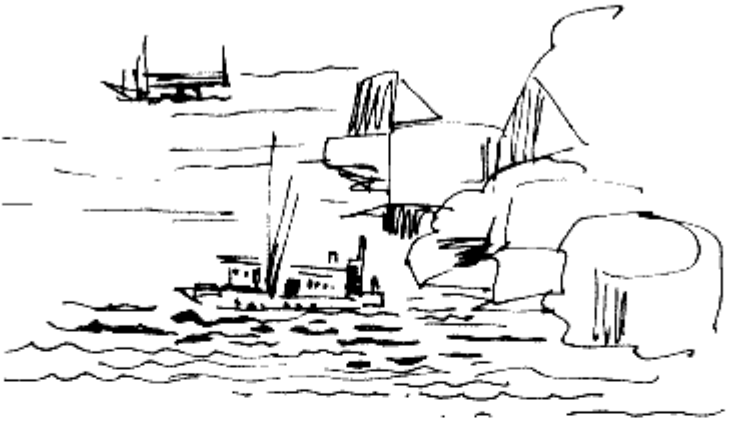

আর এক পৃথিবীর জন্যে

এই যে নক্ষত্ররাজি, অতি পুরাতন
আকাশটা জরাজীর্ণ, তাই
সবে হল জন্ম যার, সেই
নতুন পৃথিবী আমি চাই।

ইকবাল

মানুষ যতদিন থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে ততদিন থেকেই তার চেষ্টাঃ পৃথিবীটাকে কি করে বদলানো যায়, কি করে তাকে মানুষের বাসের আরো উপযোগী, আরো সুন্দর করে তোলা যায়। তাই পৃথিবীতে আসবার সেই প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়েছে তার সংগ্রাম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে, চারপাশের পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই, দুনিয়াকে বদলাবার লড়াই। মানুষ চেয়েছে প্রকৃতিতে, তার পরিবেশকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

প্রকৃতি কিন্তু এই সংগ্রামে সহজেই হাল ছেড়ে দেয় নি। নানান জায়গার বিচিত্র প্রকৃতি মানুষকে বাধ্য করেছে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। নানান দেশে নানান ধারায় গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ, নানা রকম হয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার ধরন।

তবে কি মানুষই প্রকৃতির কাছে হার মেনে হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষটায়?—না, তাও তো নয়। মানুষের স্বভাবই এই যে, বার বার পিছু হটেও সে হারকে স্বীকার করে নেয় না, বার বার হার মেনেও নতুন জীবনের স্বপ্ন কখনো তার মন থেকে মুছে যায় না। নতুন কৌশলে নতুন উদ্যমে সে আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই এ এগিয়ে যায়। বুদ্ধির আলোকদীপ্ত মেহনতি মানুষ তাই সাগরের বুক থেকে ছিনিয়ে আনে ফসল ফলানো জমি, কলস্রোতা নদীর ধারাকে ঘুরিয়ে দিয়ে উর্বর করে তোলে অনুর্বর ফসলের খেত, শহর-গঞ্জ-বন্দরের মধ্যে হাজার যোজন পথ বসিয়ে সহজ করে তোলে মানুষে মানুষে যোগাযোগ।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই এ, পৃথিবীকে বদলে দেবার কাজে বিজ্ঞান হল এক শক্তিশালী হাতিয়ার। জন্মের সেই প্রথম প্রভাতে মানুষের কেবল ছিল হাত, তারপর হল হাতিয়ার। প্রথমে ভোঁতা হাতিয়ার, তারপর ধারালো হাতিয়ার, তারপর আরো কতো রকমের হাতিয়ার। শুধু হাতে মানুষের কতটুকুই বা শক্তি! কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বিপুল এক হাতিয়ারের ভাণ্ডার—দুনিয়াকে বদলাবার কাজে অফুরন্ত শক্তির উৎস।

গত এক শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যেমন হয়েছে বিপুল অগ্রগতি তেমনি প্রকৃতিকে বদলাবার কাজেও মানুষের এসেছে বিরাট সাফল্য। কিন্তু এতেও তো মানুষ সন্তুষ্ট নয়। এখনো পৃথিবীর ওপরকার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ জায়গায় চাষ-আবাদ হয়। এখনো দুনিয়ার বৃষ্টিহীন মরুভূমির মাত্র পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ জায়গাতেই কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে চাষবাস করা যায়। এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার উত্তরে বহু লক্ষ বর্গকিলোমিটার জায়গা প্রায় সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, চাষবাস চলে না, এমন কি যাতায়াতও চলে না। এসব জায়গাকে কি শস্যশ্যামল করে তোলা যায় না?

বাংলাইন্টারনেট.কম

সাহারার বুকে সাগর

জার্মানীর এক ইঞ্জিনিয়ার—নাম তাঁর হেরমান সোর্গেল। সোর্গেল পরিকল্পনা তৈরি করলেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মরুভূমি সাহারাকে শস্যশ্যামল জনবসতিতে পরিণত করার। সোর্গেল বললেন, কংগোর অববাহিকার চারপাশে এমন উঁচু মালভূমি দিয়ে ঘেরা যে এখানে সহজেই একটা কৃত্রিম সাগর সৃষ্টি করা যেতে পারে। কাসাই উপনদী যেখানে কংগোতে পড়েছে সেখান থেকে ব্রাজাভিল শহর পর্যন্ত নদী বেশ নিচু আর রীতিমতো চওড়া—গড়পড়তা পাঁচ কিলোমিটার থেকে কোথাও কোথাও ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত। আসলে প্রাগৈতিহাসিককালে কংগো অববাহিকায় যে সাগর ছিল তার প্রমাণ আছে। কোন কারণে এই সাগরের পানি উপকূলের উঁচু জমির ভেতর দিয়ে পথ কেটে নেওয়াতেই সাগর শুকিয়ে গিয়ে কংগো নদীর মোহনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

কাজেই কোন উপায়ে স্ট্যান্‌লিপুলের কাছাকাছি পাহাড় গুঁড়িয়ে যদি নদী মুখটা বন্ধ করে দেয়া যায় তাহলেই আবার সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে মতো একটি সাগরের সৃষ্টি হবে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে এই সাগরে আয়তন হবে ১৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, পরিধি হবে ছ'হাজার কিলোমিটা আর গভীরতা হবে প্রায় তিনশো মিটার। নদীর মুখ বন্ধ করার জন্যে পাহা ভাঙ্গার কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর বাঁধের মু থেকে তীব্র ধারায় নদীর মোহনার দিকে যে পানি নেমে আসবে তা থে পাওয়া যাবে অঢেল বৈদ্যুতিক শক্তি। সে পানিকেও ব্যবহার করা যেতে পা কৃষিখেতে জলসেচের জন্যে।

এমনি আর একটি কৃত্রিম সাগর সৃষ্টি করা যেতে পারে উত্তর আফ্রিকা চাদ হ্রদের অববাহিকায়। কংগোর সবচেয়ে বড় উপনদী উবাংগী যেখা উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে সেখান থেকে চাদের অববাহিকার দূরত্ব খুব বে নয়। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে খাল কেটে উবাংগীকে যদি চাদের উপত্যক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে উবাংগীর প্রচুর পানি নদী হয়ে চাদ হ্রদে গি পড়বে। চাদ উপত্যকা পানিতে ভরে গেলে সে পানি বেরোবার পথ করা জন্যে আগার মালভূমির ধার ঘেঁষে উত্তর-পশ্চিম দিকে বইতে শুরু করবে সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ এসে পৌঁছবে দক্ষিণ আলজেরিয়া তারপর তিউনিসিয়ার মধ্য দিয়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে। এই প্রবাহ থেকে নদীর উৎপত্তি হবে তাকে 'দ্বিতীয় নীল' বললে ভুল হবে না। কারণ এই নদী সাহায্যে উত্তর আফ্রিকার বন্দরগুলো থেকে মধ্য-আফ্রিকার ব্রাজাভিল পর্য অনায়াসে যাতায়াত করা সম্ভব হবে।

এই সব নদীর জলস্রোত ব্যবহার করে আফ্রিকার খনিজ সম্পদ কাজে লাগানো আর আফ্রিকায় কলকারখানা গড়ে তোলা অনেক সহজ হ আসবে। কলকারখানায় তৈরি হবে রাসায়নিক সার; চাষবাস হবে অনে সহজ। দুনিয়ার একটি অতি অনুন্নত জনহীন অঞ্চল ভরে উঠবে মানুষে কলকাকলিতে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

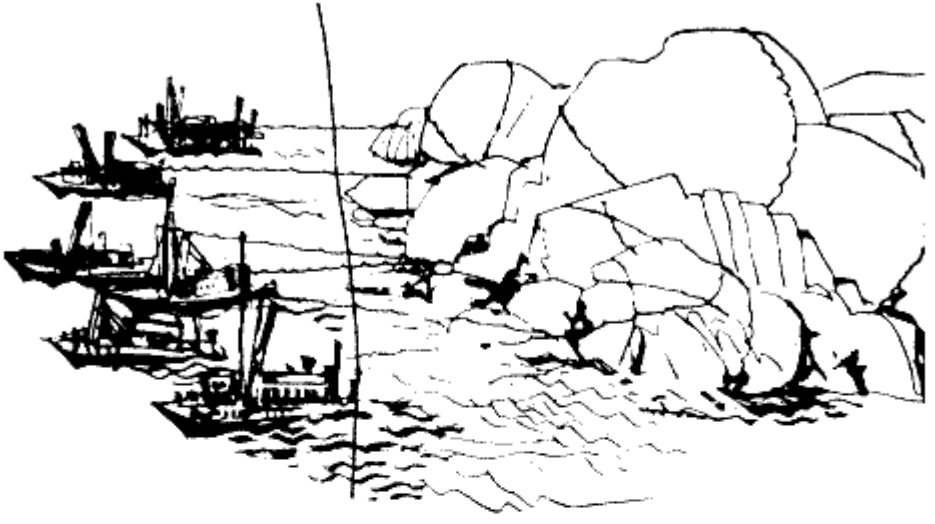

আবহাওয়া বানাবার কারখানা

এশিয়ার আর আমেরিকার উত্তরে বিশাল এলাকা বছরের বেশিরভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে। জানা গেছে, এই সব অঞ্চলে আছে প্রচুর খনিজসম্পদ। কিন্তু যেখানে জনমানুষ নেই, সেখানে খনিজ সম্পদের সম্মান করে কে? তাহলে প্রশ্ন জাগে ঃ এসব অঞ্চলের প্রচণ্ড শীতকে কি তাড়ানো যায় না?

রুশ দেশের বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার এ. আই. গুমিলিন ভাবছিলেন এই কথাটা নিয়ে! তিনি বের করেছেন এক সমাধান। উত্তর আমেরিকার আলাস্কার পশ্চিম প্রান্তে প্রিন্স অব ওয়েলস্ অন্তরীপ আর সাইবেরিয়ার পুব প্রান্তে পূর্ব অন্তরীপের মধ্যে আছে ছোট এক ফালি সমুদ্র—মাত্র ৫৮ কিলোমিটার চওড়া। এই বেরিং প্রণালীতে যদি একটা বাঁধ দেয়া যায় আর তার মধ্যে বিরাট পাম্প বসানো যায় প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ জলস্রোতকে উত্তর সাগরে চালান করে

বাংলাইন্টারনেট.কম

দেবার জন্যে তাহলে কি হয়? বেরিং সাগর থেকে শুরু করে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত সারাটা উত্তর সাগরে সৃষ্টি হবে একটি উষ্ণ এলাকা—পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলের আবহাওয়াই যাবে বদলে।

এর ফলে এশিয়া আর আমেরিকার উত্তর উপকূলের আবহাওয়া মানুষের জন্যে অনেক বেশি উপযোগী হয়ে উঠবে। বেরিং প্রণালীতে এই বিরাট বাঁধ দেবার ফলে উত্তর সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে বরফের চাঁই ভেসে আসা বন্ধ হবে, বেরিং সাগরের সব বরফ গলে যাবে, ঠাণ্ডা কামচাট্‌কা স্রোতের আর নাম- নিশানা থাকবে না। ইউরোপের সবচেয়ে উত্তরের বন্দর মুরমানস্ক থেকে পূর্ব সাইবেরিয়া পর্যন্ত অনায়াসে জাহাজ চলাচল করতে পারবে। তেমনি উত্তর আমেরিকার জাহাজ চলাচল সম্ভব হবে হাডসন উপসাগর থেকে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত।

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, বেরিং প্রণালীর বাঁধ হবে আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দু'টি শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরাট এক ঐতিহাসিক সেতুবন্ধ। এই বাঁধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আরো বাড়িয়ে তোলা যায়। আর এই দু'টি দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যদি বাড়ে তাহলে দুনিয়ায় শান্তি আর সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা হবে।

আবহাওয়া বদলাবার এমনি আর এক প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক জন আইজাক্‌স্। কালিফোর্নিয়ার দক্ষিণে যে সব শস্যবিরল মরু অঞ্চল আছে সেগুলোকে শস্য-শ্যামল করে তোলার জন্যে আইজাক্‌স্ মেরু প্রদেশের বরফের স্তূপ টেনে আনবার প্রস্তাব করেছেন। হিসেব করে দেখা গিয়েছে ছ'খানা শক্তিশালী গাদাবোট দিয়ে একহাজার কোটি টন ওজনের একখানা ভাসমান হিমশৈল দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ায় টেনে আনা যেতে পারে।

তারপর তাকে কোন বন্ধ খাঁড়িতে বা এই জাতীয় কৃত্রিম জলাশয়ে গলিয়ে ফেলা হবে। এমনিভাবে পানি এনে একটা জলাশয় ভর্তি করতে খরচ পড়বে হয়তো দশ লক্ষ ডলার, কিন্তু হিমশৈলে যে মিষ্টি পানি পাওয়া যাবে তার দাম হবে দশ কোটি ডলারের কম নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মালবওয়া জাহাজও হাজার ডলারের বেশি দামের পানি বইতে পারে না। এই বিপুল পরিমাণ পানিকে খাল কেটে শুকনো জমির ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়া যায়।

কিন্তু চাষাবাদের জন্যে পানির দরকার শুধু আমেরিকাতেই নয়। মধ্য এশিয়ায়, ভারতে, ইরানে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়—সারা দুনিয়াতেই এমনি পানির অভাব। আর এইসব অঞ্চলেও দুনিয়ার চেহারাকে বদলে দেবার জন্যে এমনি আরো বহু পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন।

হয়তো বলবে এগুলো বুঝি বিজ্ঞানীদের নিছক আকাশচারী কল্পনাই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে আজ যেটা স্বপ্ন, কালই সেটা জ্বলজ্যান্ত বাস্তব। আমাদের পূর্বপুরুষরা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলেন যে, মানুষ আকাশে উড়তে পারবে, চোখের নিমেষে খবর পৌঁছে দেবে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে গ্রহ-নক্ষত্র ভরা সীমাহীন মহাশূন্যের পানে? কিন্তু এ সবই আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে। আণবিক শক্তির আবিষ্কার হবার ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মানুষ দুনিয়ার চেহারা এমনভাবে বদলে দিতে পারবে যা আগে কখনো সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সত্যি সত্যি মানুষ কি এই নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারবে? হাসি আর গানে, প্রাচুর্য আর প্রাণবন্যায় উদ্ভাসিত পৃথিবী গড়ে তোলা সত্যি সত্যি কি সম্ভব হবে? যুদ্ধ, ধ্বংস আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে শান্তি, সৃষ্টি আর জীবনের শক্তি কি জয়লাভ করবে?

আগামী দিনের স্রষ্টা আর কারিগর তোমরাই এ প্রশ্নের জবাব দেবে।

বাংলাইন্টারনেট.কম

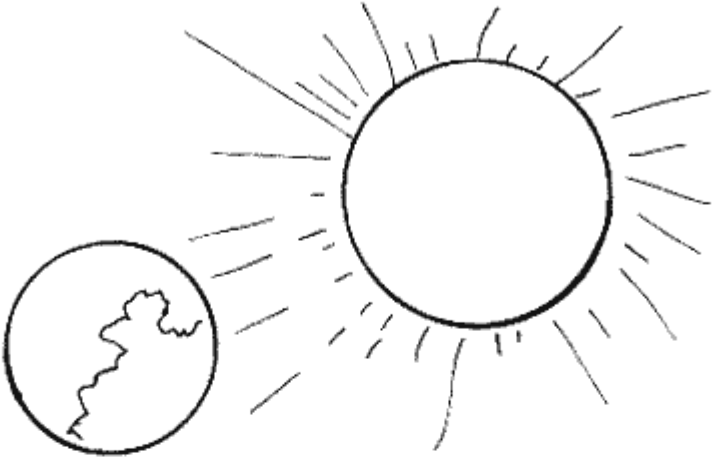

ছোট আর বড়

মুক্তা যেন ক'দিনের মধ্যে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরায় তাকে আর এখন চেনা যায় না প্রায়। কিন্তু পড়ায় সে কিছুতেই ভাল করতে পারে না—পরীক্ষায় করে বসে ফেল। মা বক্‌লেন ঃ ধাড়ি মেয়ে হয়েছ, অথচ এখনো ক্লাস সিক্‌স পেরোতে পারলে না।

মুক্তা কেঁদে-কেটে চোখ-মুখ লাল করে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে-সত্যি সত্যি সে কি খুব একটা বড় হয়ে গিয়েছে।

সেবার তাদের শহরে সার্কাসের পার্টি এসেছিল। ওদের হাতিটা রোজ সকালে-বিকালে মুক্তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে শুঁড় দুলিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যেত। কত উঁচু যে সে হাতি—মনে হত মাহুতটা যেন আকাশের ওপর বসে আছে। আবার আমেরিকায় নাকি একশো চার তলা উঁচু এক বাড়ি আছে—হাতির চেয়ে সে আরো কত উঁচু।

বাংলাইন্টারনেট.কম

আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং উঁচুতে আধ কিলোমিটারের মতো—হিমালয়ের চূড়ো এভারেস্ট না হয় ন'কিলোমিটার উঁচু হবে। কিন্তু এসবের সাথে যদি তুলনা করা যায় আমাদের পৃথিবীটার? পৃথিবীকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলে তার এদিক-ওদিক পর্যন্ত ব্যাস হবে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। তাহলেই এখন বোঝ আমাদের বাড়ি-ঘর পাহাড়-পর্বতের চেয়েও পুরো পৃথিবীটা কত বড়।

কিন্তু পৃথিবীকে ছাড়িয়ে একটু বাইরে বেরুলেই এও যেন একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস প্রায় দশ গুণ বেশি। আবার সূর্যের ব্যাস তারও একশো গুণ। তের লক্ষ পৃথিবীকে এক সাথে করলে তবে তা সূর্যের আকারের সমান হবে। (আর সূর্য যে কী ভারি শুনবে? ৩,৩৩,০০০টা পৃথিবীকে দাঁড়ির এক পাল্লায় বসালে তবে সে সূর্যের ওজনের কাছাকাছি পৌছতে পারবে।) অনেক তারা আছে যেগুলো আমাদের সূর্যের চেয়েও আরো অনেক বড়।

সূর্য পৃথিবী থেকে কত দূরে আছে সেটা কল্পনা করাও শক্ত। আলোর গতির হিসেব দিয়েই ধরা যাক ঃ আলো এক সেকেণ্ডে পাড়ি দেয় প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ; অর্থাৎ আলো যদি ঘুরপথে ছুটতে পারত তাহলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর চারপাশে তার সাত পাক ঘোরা হয়ে যেত। সূর্য আবার পৃথিবী থেকে এত দূরে আছে যে, সূর্য থেকে আমাদের কাছে আলো এসে পৌছতে পুরো আটটি মিনিট সময় লাগে। সৌরজগতের বাইরে সব চাইতে কাছে-পিঠের যে তারাটি সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে আলোকের একটানা সোয়া চার বছর ধরে ছুটে আসতে হয়।

এ-তো তবু ভাল। আমাদের সৌরজগৎ হল 'ছায়াপথ' নামে একটা বিরাট গ্যালাক্সি বা নীহারিকাজগতের ছোট্ট একটা টুকরো—এতে আছে সূর্যের মতো আরো অগুণতি তারা। এই সব তারা নিয়ে যে ছায়াপথ তার ব্যাস হল ১,০০,০০০ আলোক-বছর-অর্থাৎ তার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় আলো গিয়ে পৌছতে এক লক্ষ বছর কেটে যায়। এই নীহারিকার কেন্দ্র থেকে আমাদের পৃথিবী রয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার আলোক-বছর দূরে। কিন্তু গ্যালাক্সি তো কেবল একটাই নয়, মহাবিশ্বে এমন সব গ্যালাক্সির কথাও

বাংলাইন্টারনেট.কম

জানা গিয়েছে, যা আমাদের কাছ থেকে হাজার কোটি আলোক-বছর দূরে রয়েছে।

এ-সব কথা ভাবলে কি আর মনে হয় মুক্তা খুব বড়? মোটেই নয়—বরং ঠিক তার উলটো। মনে হয় এই দুনিয়ার বড়র পাল্লার মধ্যে আমাদের মুক্তা যেন কিছুই নয়—একেবারে কিছুই নয়!

কিন্তু তাই বলে মুক্তা কি একেবারে নেহাতই ছোট?

একটা ছোট সিকি বা পঁচিশ পয়সার কথা ভাবা যাক; মুক্তার হাতের তালুতে পড়ে থাকবে। ধরা যাক মুক্তা হল লম্বায় দের মিটারের কাছাকাছি আর এই সিকিটা কিনা একেবারে মোটে দুই সেন্টিমিটারের মতো। কিন্তু খালি চোখে সব চাইতে যে ছোট ধুলোর কণা দেখা যায় তা-ই এক সেন্টিমিটারের দু'শো ভাগের এক ভাগ। আর ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে খুব ছোট যে কণা দেখতে পাওয়া যায় তা হল এক সেন্টিমিটারের প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। অ্যাটম বা পরমাণুর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। দুনিয়ার সব জিনিসই আসলে গোড়ায় পরমাণু দিয়ে তৈরি। ছোট ছোট অগুণতি ইঁট সাজিয়ে যেমন মস্ত বড় বাড়ি তৈরি হয় তেমনি অগুণতি পরমাণু সাজিয়ে তৈরি হয়েছে দুনিয়ার ছোট বড় রকম-বেরকম সমস্ত জিনিস। এগুলো আবার মাপে এত ছোট যে প্রায় দশ কোটি পরমাণু পাশাপাশি সাজালে তবে হবে তা এক সেন্টিমিটারের সমান।

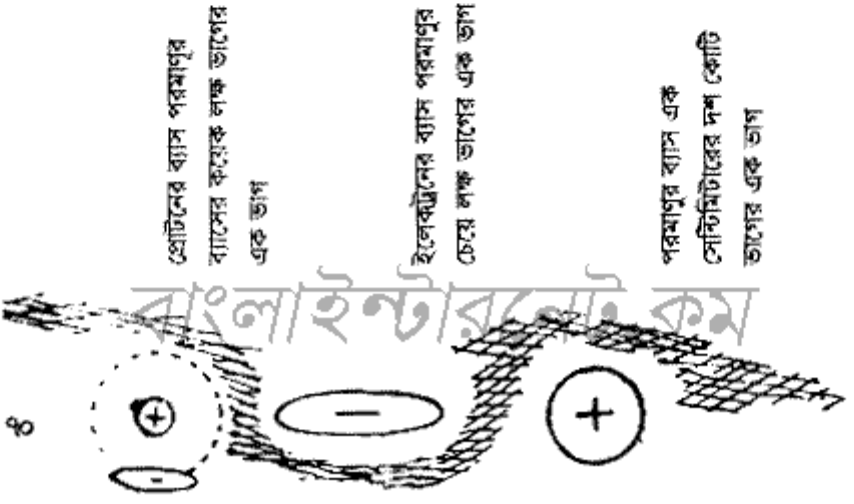

বাংলাইন্টারনেট.কম

সবচেয়ে দূরের নীহারিকা
১,০০০ কোটি আলোক-বছর দূরে

ছায়াপথের ব্যাস প্রায়
১,০০,০০০ আলোক -বছর

সবচেয়ে কাছের তারা থেকে
আলো আসতে সোয়া চার
বছর লাগে

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৭৫০
কিলোমিটার

হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ
উঁচুতে ৮,৮৪৮ ফুট

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং
প্রায় ৪৪৯ মিটার উঁচু

মুক্তা লম্বায় প্রায় দেড় মিটার

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সবচেয়ে ছোট
কণা দেখা যায় ০.০০০০১
সেন্টিমিটার

বাংলাইন্টারনেট.কম

এই সব নানা জিনিসের নানা রকমের পরমাণুর মধ্যেও কিন্তু আবার ইলেকট্রন আর প্রোটন নামে আরও ছোট ছোট কতকগুলো কণা আছে। এরা আসলে দু'রকমের বিদ্যুতের কণা। ইলেকট্রন হল 'না'-বিদ্যুতের আর প্রোটনগুলো 'হ্যাঁ'-বিদ্যুতের কণা। এক সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ কোটি ইলেকট্রন পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা যায়; আর অনেকগুলো প্রোটনকে এক সাথে জড়ো করলে তবে তার আকার হবে একটা ইলেকট্রনের সমান।

এসব কথা ভাবলে তখন কিন্তু মুক্তাকে আবার নেহাত ছোট বলেও মনে হয় না। মনে হয় মুক্তা যেন এদের তুলনায় কত বড়— ক-তো বড়!

তাহলে মুক্তা এমন কিছু বেয়াড়া রকমের বড়ও হয়ে যায় নি—বেয়াড়া রকমের ছোটও হয় নি। প্রকৃতির ছোট-বড় দুই সীমানার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে।

আর প্রকৃতির ছোট-বড়র মাপকাঠির এমনি মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে বলেই না মানুষ আজ দু'দিকেই বহু দূর পর্যন্ত তার বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর জাল ফেলতে পারছে!

বাংলাইন্টারনেট.কম